মাটি ও মানুষের গল্প

সম্পাদনা

বীরেন চন্দ

উত্তরধ্বনী প্রকাশনী
বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

প্রকাশকাল : চৈত্র, ১৩৬৪

প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা—১২

২, সূর্য্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা এবং শিলিগুড়ি ।

গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী :

৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বাণী লাইব্রেরী : কলেজ রোড, শিলিগুড়ি

বঙ্গ ভারতী : কলেজ রোড, শিলিগুড়ি ।

প্রচ্ছদ : অমর দে, লোকচিত্রকলার সৌজন্যে

প্রকাশক : অশোক ভট্টাচার্য্য, উত্তরধ্বনি, বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট,

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, ফোন : ২২০০৩

মুদ্রক : বারীন সরকার, সুজনী প্রিন্টার্স বিধান রোড, শিলিগুড়ি ।

ভূমিকা

'মাটি ও মানুষের গল্প' প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা একপ্রকার আকস্মিকভাবেই গ্রহণ করেছি এবং এই কাজে কিছুটা অগ্রসর হয়ে বুঝতে পেরেছি যে এর জন্য যতটা শ্রম ও অর্থব্যয় প্রয়োজন তা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। তবুও হাল ছাড়িনি। চেষ্টা করেছি মাত্র।

এই সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্য, বাংলা সাহিত্যে তথা ছোটগল্পে বর্তমানে যে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একপ্রকার শেকড়হীন কল্পনা-শক্তির প্রতিযোগিতা চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমাদের পূর্বসূরী গল্পকারদের কয়েকটি গল্প উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করা হয়েছে। উত্তরসূরীদের কয়েকটি গল্প তুলে ধরতে চেয়েছি, তরুণ গল্পকারদের একটা অংশ মাটি ও মানুষের প্রতি আজও আস্থাবান। এরা সফল কিনা সে বিচার পাঠকেরা করবেন। মুন্সী প্রেমচন্দের অনুবাদ গল্পটি প্রকাশ করা হয়েছে এই ভেবে যে শোষণ যন্ত্রণার দেশকাল পাত্র নেই। কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে তা সর্বত্র সমানভাবে চলেছে। সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে গণশক্তি ও 'নন্দন' পত্রিকা, লোকচিকলার শিল্পী অমর দে, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গল্পগুচ্ছ পত্রিকার অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়-এর কাছে আমরা ঋণ স্বীকার করছি।

—সম্পাদক

উৎসর্গ

চিরন্তন বাংলার মাটি ও মানুষের উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

পূর্বসূরীদের গল্প

উত্তরসূরীদের গল্প



দুর্বসুরী

সওয়া সের গম

প্রেম চন্দ

এক গ্রামে শংকর নামে কুরমি সম্প্রদায়ের এক গরিব কৃষক বাস করতো। সে খুবই সাদাসিদে ধরনের নিরীহ মানুষ, সারাদিন নিজের চাষবাস নিয়েই থাকে। কারো কোন ব্যাপারেই নাক গলায় না। আসলে ছল-চাতুরি তাকে স্পর্শমাত্র করেনি, ফলে মানুষ ঠকাবার কৌশলটি তার বরাবর আয়ত্তের বাইরেই থেকে গেছে। স্বভাবতঃই তাকে কেউ ঠকাতে পারে, এমন চিন্তাও তার ছিল না। যদি খাওয়ার কিছু

জোটে তবে খায়, নয়তো একমুঠো ছোলা চিবিয়েই রাত কাটায়। যদি তাও না পায়, তবে একগ্লাস জল খেয়েই পেট ভরায়, আর রামনাম করতে করতেই চুপচাপ শুয়ে পড়ে। কিন্তু যখন কোনো অতিথি দরজায় এসে উপস্থিত হয়, তখন এই নিরাসক্ত লোকটিকেও ব্যস্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। বিশেষ করে যখন কোনো সাধু-সন্ন্যাসী তার গৃহে পদার্পণ করেন, তখন তাকে বাধ্য হয়েই সাংসারিক জীবনযাত্রার সাহায্য নিতে হয়। শংকরের মতে, নিজে যত খুশি না খেয়ে শুয়ে থাকা যায় কিন্তু সাধু-বাবাদের কী করে খেতে না দিয়ে শুতে বলা যায়? এই সাধু-বাবারাই তো সাক্ষাৎ ভগবানের আসল ভক্ত!

একদিন সন্ধ্যায় এক মহাত্মা সন্ন্যাসী এসে শংকরের ঘরের সামনেটাতে জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর বিরাট তেজোদীপ্তময় চেহারা, গলায় পীতাম্বর জড়ানো, মাথায় জটা, হাতে পিতলের কমণ্ডলু, চোখে চশমা, দুই পায়ে সোজা টান্‌টান্‌ দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে চোখ ফেরানো যায় না। তাঁর বেশবাস সেই ধরণের মহাত্মাদের মতই ছিল, যাঁরা সাধারণতঃ বড়োলোকের বাড়ির প্রসাদ পেয়েই তপস্যা করে থাকেন, মোটর-গাড়িতে চেপে ধর্মস্থানগুলিতে পরিক্রমা করে থাকেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য রুচিকর সুখাদ্যই গ্রহণ করে থাকেন। অথচ এদিকে শংকররা তো রোজই যবের আটা খায়। তা এই যবের আটা কী করে সাধু-বাবাকে খাওয়ানো যায়? আগেকার দিনে যদিও যবের আটা সুখাদ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমানে যবের আটা সিদ্ধ পুরুষ-দের পক্ষে দুস্পাচ্য খাদ্য। শংকরের খুবই চিন্তা হলো—সাধু-বাবাকে কী খাওয়ানো যায়? অবশেষে ঠিক করল যে, আশে-পাশে কারও কাছ থেকে গমের আটা ধার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু সারা গ্রামে

কারও বাড়িতে গমের আটা পাওয়া গেল না। গ্রামে যারা বাস করতো, তারা তো সবাই সাধারণ গরিব মানুষ, দেবতা একজনও না। অতএব দেবতার আহার পাওয়া যাবে কী করে? সৌভাগ্যবশতঃ গ্রামের ব্রাহ্মণ বিপ্রমহারাজের কাছে সামান্য কিছু গম পাওয়া গেলো। শংকর তার কাছ থেকে মাত্র সওয়া সের গম ধার করে এনে স্ত্রীকে গমটা পিষে দিতে বললো। কিছুক্ষণ বাদে সাধু-বাবাকে খেতে দেওয়া হলো এবং তিনি খেয়ে-দেয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। আর পরদিন সকালে শংকরকে আশীর্বাদ করে নিজের পথে চলে গেলেন।

গ্রামের সেই বিপ্রমহারাজ বছরে দু'-দুবার ফসল ঝাড়াই-মাড়াই করান। ব্রাহ্মণ বলে কথা! গ্রামের চাষীরাও তাদের যা-যা ফসল হয়, সব কিছু থেকেই ব্রাহ্মণকে 'সিধে' দিয়ে থাকে। শংকর ভাবলো মাত্র সওয়া সের গম বিপ্রজীকে কী করে আর ফেরত দেওয়া যায়? তার চেয়ে সিধে দেবার সময় বরং এক পাল্লার চেয়েও কিছু বেশি ফসল দিয়ে দেবো! উনিও বুঝবেন এতটা বেশি দিলাম, আর আমারও কাজ হয়ে যাবে।

চৈত্র মাসে যখন বিপ্রজী সিধে নিতে আসলেন, তখন তাকে শংকর প্রায় দেড় পাল্লা গম মেপে দিয়ে দিলো। সে মনে-মনে নিজকে ঋণমুক্ত ভেবে নিয়ে এ ব্যাপারে বিপ্রজীর সাথে আর কোনো রকম আলোচনা করার দরকার মনে করলো না। এদিকে বিপ্রজীও আর কখনও সেই বাকি গম ফেরত চাননি। তখন কি আর এই নির্বোধ শংকরের ধারণা ছিল যে ওই সওয়া সের গমের ঋণ পরিশোধ করতে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে!

দেখতে দেখতে সাত বছর পার হয়ে গেছে। বিপ্রজী ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত থেকে মহাজন হয়েছেন, শংকর চাষী দিন-মজুর হয়ে গেছে। অপরদিকে তার ছোটো ভাই মঙ্গলও এক অন্ন ছেড়ে আলাদা সংসার পেতেছে। আগে একত্র থাকাকালীন দু'ভাই চাষীই ছিল, ভিন্ন হবার পর তারা দিন-মজুর হয়ে গেলো। শংকর এই পারিবারিক ঈর্ষাদ্বেষের আগুন মোটেই বাড়াতে চায়নি। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে। প্রথম যেদিন তাদের দু'ভাইয়ের আলাদা-আলাদা উনান জ্বালানো হলো, সেদিন শংকর সারাদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। সে বুঝতে পারলো যে, আজ থেকে ভাই-ভাই শত্রু হলো, এক ভাই আর অপর ভাইয়ের দুঃখে কাঁদবে না। একজনের ঘরে যখন উৎসবের ব্যঞ্জন রান্না হবে, তখন অপরজনের ঘরে গোলা রুটি বানানো হবে। রক্তের বন্ধন ও স্নেহের বন্ধন আজ এইভাবেই ছিন্ন হয়ে গেলো। ভগীরথ যেভাবে গঙ্গা এনেছিল, ঠিক সেই রকমই কঠোর পরিশ্রম করে শংকর এই পরিবারের বংশ-মর্যাদার বৃক্ষরোপণ করেছিল এবং বুকের রক্ত-সম জল সেচন করেই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আজ তার সমূল উৎপাটন দেখে ওর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। সাতদিন সে জলস্পর্শও করতে পারল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের কড়া রোদ্দুরে সারাটাদিন কাজ করে রাত্রে ঘরে ফিরে শুধু হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়তো। ভিন্ন হবার এই ভীষণ বেদনা ও দুঃসহ কষ্ট তার রক্ত মাংস জল করে দিয়েছে। ফলে সে এমন কঠিন অসুখে আক্রান্ত হল যে একমাসেও বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা রইল না। অতএব সংসারই বা চলবে কী ভাবে? জমি বলতে পাঁচ বিঘের অর্ধেকটা, আর একটা মাত্র বলদই

ভাগে পড়েছিল। সুতরাং এ দিয়ে আর চাষ-বাসই বা হবে কী করে? শেষ পর্যন্ত এটাই দাঁড়াল যে শংকর নামেই জমির মালিক রইলো, আসলে তাকে জীবিকানির্বাহের জন্য খেতমজুরিই করতে হলো।

এইভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন শংকর মজুরি খেটে ঘরে ফিরছে, পথে সেই বিপ্রজীর সাথে দেখা। বিপ্রজী তার দিকে আড় চোখে চেয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "এই শংকর, কাল এসে তোর বাকি-বকেয়ার হিসাবপত্র দেখে নিস্। তোর নামে তো সাড়ে পাঁচ মন গম কবে থেকে লেখা আছে, আর তুই তো ফেরত দেবার নামও করিস্ না। ব্যাপারটা কী হজম করে দিতে চাস্ নাকি?

একথা শুনে শংকর চমকে উঠলো। বলল, "কবে আমি আপনার কাছ থেকে গম ধার নিলাম, যা আজ সাড়ে পাঁচ মণ হয়ে গেলো? আপনি বোধহয় ভুল বলছেন। আমার কাছে কেউ এক ছটাক আনাজ বা একটা পয়সাও পায় না।"

বিপ্রজী–"এই রকম মিথ্যা বলার ফলই তো ভোগ করছিস রে যে দিনান্তে খাওয়া জোটেনা।"

এই কথার পর বিপ্রজী সাধুবাবাকে খাওয়াতে গম ধার নেবার সেই সাত বছর আগেকার ঘটনাটি বললেন। সব শুনে শংকর হতবাক্ হয়ে গেলো। মনে মনে বললো–হা ঈশ্বর! আমি ওনাকে কতোবার সিধে দেবার সময় বেশি-বেশি আনাজপত্র দিয়েছি, কিন্তু বিনিময়ে উনি আমার কোন্ উপকারটাই বা করেছেন? যখন পাঁজি-পুথি দেখতে বা শুভ দিনক্ষণ বলতে বাড়ীতে আসতেন, তখন কিছু না কিছু দক্ষিণা

নিয়েই যেতেন। লোকটা তো ভীষণ স্বার্থপর ! মাত্র সোয়া সের গমকে এই পিশাচটা এমনভাবে সুদে আসলে সাজিয়েছে, তা ফেরত দিতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এত বছরের মধ্যে একবারও কথাটা বলেনি। বললে পুরো গমটা কবেই চুলচেরা ওজন করে ফেরত দিয়ে দিতাম। এইভাবে কি চুপ করে বসে থাকতাম ! এতদিন লাগতোও না। সে ধীরে ধীরে বলল, "মহারাজ ,সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক ওই নাম করে যদিও কোনো সময় আমি আপনাকে কিছু ফেরত দিইনি, কিন্তু বহু-বারই আমি সিধে দেবার সময় দু'-দুসের বেশি ফেরত দিয়েছি। অথচ আজ আপনি এখন সাড়ে পাঁচ মণ চাইছেন, এ আমি এখন কোথায় পাই ?

বিপ্রজী–" দেখ্, যা যা লেখা আছে, তাই তাই বলেছি। তুই যা কিছুই সিধে দিয়ে থাকিস্ না কেন, তার কোনো হিসাব নেই। তা সে একের জায়গায় চার পাল্লাই হোক না কেন ? তোর নামে মোট সাড়ে পাঁচ মণ লেখা আছে, তুই ইচ্ছে করলে হিসাব দেখতে পারিস্। আপনাকেও ভগবানের কাছে এর জন্য জবাব দিতে হবে।"

বিপ্রজী—"দূর বোকা, ভগবানের ভয় তো তোদের। আমি ব্রাহ্মণ, আমার ভয় কি ? ওখানকার সবাই তো আমার ভাই বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি। ঋষি মুনিরা সব্বাই তো ব্রাহ্মণ রে, দেবতারাও তো ব্রাহ্মণই। যদি কিছু ভুল-চুক করে থাকি তবে তো আমি সামলেই নেবো। তা এবার কাজের কথা বল্। ধার কবে শোধ করছিস্ ?"

শংকর—"আমার ঘরে তো আর গম পড়ে নেই যে দেবো। আমাকে কারও বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে এনে তবেই না ফেরত দিতে হবে !"

বিপ্রজী—"এসব অজুহাত আমি মানতে রাজি নই। সাত-সাতটা বছর পার হয়ে গেলো, আর একদিনও আমি অপেক্ষা করবো না। গম ফেরত দিতে না পারিস্ তবে তা টাকার অংক ধরে হিসাব লিখে সই করে দে।"

শংকর—"আমার দেনা শোধ দিতেই হবে, তা সে গমই হোক বা টাকার হিসাবেই হোক। তা কীভাবে দাম হিসাব করবেন ?"

বিপ্রজী—"বাজারে পাঁচ সের করে হিসাব করা হয়। ঠিক আছে, সোয়ার হিসাবটা তোর নাম নাম থেকে কেটে বাদ দেবোখ'ন।

শংকর—"যখন সবই দিচ্ছি, তখন আর ওটুকু বাকি থাকে কেন ? সোয়াটুকু না দিয়ে আর দোষের ভাগী হই কেন ?"

হিসাবপত্র করার পর দেখা গেল যে, গমের দাম ষাট টাকা দাঁড়ালো। এই ষাট টাকার হিসাব বিপ্রজীর খাতায় লেখা হলো, আর শতকরা তিন টাকা হারে সুদ। সারা বছর এই টাকা শোধ না করতে পারলে সুদ হিসাব হবে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে। এ ছাড়া বারো আনার স্ট্যাম্প ও হিসাব লেখার কাগজের দাম হিসাবে এক টাকাও শংকরের ঘরে লেখা হলো।

সারা গ্রামের লোক বিপ্রজীর এই কাজের খুবই নিন্দা করলো, কিন্তু কেউই প্রকাশ্যে বলতে সাহস পেল না। মহাজনের কাছে কোনো কোনো ব্যাপারে প্রায় সবাইকেই যেতে হয়, তাই তার মুখের উপর আর কে বলবে ?

শংকর সারা বছর ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করলো। এক বছর চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই কোনোদিনও দুপুরের আগে উনানে আগুন দিত না। আগে তবু ছোলা খেয়ে দিন কাটাতো, আজকাল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ছেলের জন্য রাতের রুটি বানিয়ে রাখে। আগে রোজই এক পয়সার তামাক খেতো। একমাত্র এই একটাই তার নেশা ছিল যা সে কোনো দিন ছাড়তে পারেনি, আজ সেটুকুও তার এই কঠিন ব্রতর দক্ষিণা হিসাবেই ধরা পড়েছে। ফলে, সামান্য নেশাটুকুও বন্ধ হলো। সে তামাকের ছিলিমটাকে ধরে এক আছাড় মারলো, হুকাটাকে টান মেরে ভেঙ্গে ফেললো আর তামাকের হাঁড়িটাকে ভেঙ্গে গুড়ো গুড়ো করে ফেললো। আগে যদিও সে একফালি কাপড়ের টুকরো পরতো, এখন সে তাও ত্যাগ করেছে, শুধুমাত্র নেংটি পরে লজ্জা নিবারণ করতে লাগলো। হাড়-কাঁপানো শীতও সে আগুন পুইয়েই কাটিয়ে দিল। স্বভাবতঃই এই ধ্রুব সংকল্পের ফল সে আশানুরূই পেলো। বছরের শেষে তার কাছে মোট ষাট টাকা জমা হলো। সে ভাবলো যে—বিপ্রজীকে এই ষাট টাকা দিয়ে বলবো—মহারাজ বাকি টাকাটা তাড়াতাড়িই ফেরত দেবো। আর তো মাত্র পনের টাকার ব্যাপার। এই সামান্য ক'টা টাকার ব্যাপারে অনুরোধ করলে বিপ্রজী নিশ্চয়ই দয়া করবেন। এই টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ি গেলো এবং পায়ের কাছে টাকাটা রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বলে উঠলো, "কী রে, কারও কাছ থেকে ধার করে আনলি নাকি?"

শংকর—"না মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আজকাল মজুরি

মোটা-মুটি মন্দ পাই না।"

বিপ্রজী—"আরে ! এ তো ষাট টাকা মোটে ?"

শংকর—"হ্যাঁ মহারাজ, দয়া করে এখন এই টাকাটাই নিন। বাকিটা দু'-তিন মাসের মধ্যেই দিয়ে যাব। এবার আমাকে ঋণমুক্ত করুন।" বিপ্রজী—"ঋণমুক্ত ? আরে ঋণমুক্ত হওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার নাকি রে ? ঋণমুক্ত তখনই হওয়া যায় যখন তুই আমার পাওনা কড়ায়-গন্ডায় শোধ করে দিবি। যা, যা, বাদ বাকি আরও পনের টাকা নিয়ে আয়।"

শংকর—"মহারাজ, আমায় দয়া করুন। এখন আমার এত টানা-টানি যে রাতে খাবার শুকনো রুটিও রোজ জোটে না। তা গ্রামে যখন আছি, তখন একদিন না একদিন ঠিকই শোধ দিয়ে দেবো।"

বিপ্রজী শংকরের এই কাতর আবেদনে সাড়া দিলেন না। বললেন, "দেখ শংকর, আমি এই সব বদ-অভ্যাস মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। যদি সব টাকা ফেরত না দিস্ তবে আজ থেকে তোকে সব টাকার উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে সুদ গুণতে হবে। তোর টাকা চাস্ তুই ঘরেই রাখ বা আমায় শোধ দে, যা খুশি কর। এই আমি পরিষ্কার বলে দিলাম।

শংকর—" আচ্ছা ঠিক আছে মহারাজ, যে ষাট টাকা এনেছি দয়া করে সেটা রাখুন। দেখি যাই চেষ্টা করি গিয়ে, যদি কোথাও পনের টাকা পাই।

এরপর শংকর সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে পনের টাকা জোগাড়ের চেষ্টা

চললো। কেউই তাকে টাকা দিলো না।

শংকরকে বিশ্বাস করে না বলে যে দেয়নি তা নয়, আসলে কারো কাছেই দেবার মতো টাকা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের লোকেরা এতই গরিব যে বিপ্রজীর কাছ থেকে এই শিকার ছাড়িয়ে নিতে সহযোগিতা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

জাগতিক নিয়মেই সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। তাই সারা বছর উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও যখন ঋণমুক্ত হতে পারলো না, তখন শংকর হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

সে ভাবলো—সারাটা বছর এত পরিশ্রম করেও যখন ষাট টাকার বেশি জমাতে পারলাম না, তা হলে আর কোন্ উপায়ে এর বেশি টাকা জমাবো? ঋণের বোঝা যখন মাথায় চেপে থাকবেই, তখন এক মণই বা কি আর সোয়া মণই বা কি? তার পরিশ্রম করার উৎসাহ কমে গেলো। খাটুনির প্রতি অছেদ্দা ধরে গেলো। জগতে আশা থেকেই উৎসাহের জন্ম হয় এবং এই আশাই মানুষকে কাজে শক্তি জোগায়। কেননা, আশাই প্রকারান্তরে জগতসংসারের সব কিছুকেই পরিচালিত করে থাকে শংকর আশাভঙ্গ হওয়ার ফলে আরও উদাসীন হয়ে পড়লো। যে ঋণ একদিন ভিখারির বেশ ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে তাগাদা দিয়ে শংকর-কে সারা বছর ধরে পরিশ্রম করতে উদ্যোগী করেছিল, সে আজ পিশাচিনীর মতো বুকের উপর চেপে বসে নিজের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় না হওয়া পর্যন্ত শংকরকে রেহাই দেবে না। আগে কাপড় চোপড় ছিঁড়লে শংকর তালি লাগিয়ে পরতো। তা, বলে কাপড়ে তালি

লাগাবারও একটা সীমা আছে। কিন্তু আজকাল আর সে অত তালি দেয় না। মজুরি পেলে আগের মত আর টাকা জমায় না। হয় কাপড়-চোপড় কেনে, নয় খাবার কিছু। আগে যে শুধু তামাকই টানতো, ইদানিং সে গাঁজা অথবা চরসও ধরতে আরম্ভ করেছে। মজুরির টাকা ঠিকমতো আদায় করার দিকেও তার খেয়াল থাকছেনা, ভাবখানা যেন তার কাছে কেউ একটা পয়সাও পায় না। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলেও সে আগে কাজ কামাই করতো না, অথচ আজকাল তাকে যে কিসে পেয়েছে, কেবলই কাজে না যাবার ছুতো খুঁজতে থাকে।

এইভাবেই তিন-তিনটে বছর পার হয়ে গেলো। বিপ্রজী একবারও টাকার জন্য তাগাদা করেননি। তিনি চতুর শিকারীর মতো মোক্ষম ঘা দেবার জন্য ওঁত পেতে ছিলেন। আগে থেকে শিকারকে সজাগ করা তার নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

এরপর একদিন বিপ্রজী শংকরকে ডেকে সব হিসাবপত্র দেখালেন। সেই যে ষাট টাকা জমা ছিল, তা বাদ দিয়ে হিসাব করলেও শংকরের নামে একশো কুড়ি টাকা ঋণ দেখানো হয়েছে।

সব দেখেশুনে শংকর বলে উঠলো, "ওরে বাবা এত টাকা আমি এজন্মে কী করে শোধ করবো ? সামনের জন্মে দেখা যেতে পারে।

বিপ্রজী—"তা হবে না, আমি এ জন্মেই চাই। আসল টাকা না দিলেও সুদ তোকে দিতেই হবে।"

শংকর—"একটা মাত্র বলদ আছে, সেটাকে নিতে পারেন। একটা

মাটির কুঁড়েঘর আছে সেটাকে নিতে পারেন। আর আমার বলতে কী-ই বা আছে?

বিপ্রজী—"বলদ্-টলদ্ দিয়ে আমি কী করবো! ওসব বাদ দিলেও তোর দেবার মত অনেক কিছু আছে রে?

শংকর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আর কী আছে মহারাজ?

বিপ্রজী—"আরে আর কিছু না থাক্ তুই তো আছিস্। আসলে ব্যাপারটা হলো যে, শেষমেষ তোকেও কোথাও না কোথাও মজুর খাটতে যেতেই হয়, আর আমাকেও জমি চাষ করাতে জন-মজুর রাখতে হয়। তাই বলছি কি টাকা যখন শোধ করতে পারছিস, না, তখন সুদের বিনিময়ে আমার জমিতেই কাজ কর। যখন সুবিধে হবে আসল টাকা ফেরত দিবি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার টাকা-পয়সা না চুকিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তুই তো আর এই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও কাজ খুঁজতে যেতেও পারিবি না। আবার কোনো জমি-জমাও নেই। সুতরাং এত টাকার ব্যাপার আমি কোন্ বিশ্বাসে ছেড়ে দিই! কে তোর জামিনদার হবেন যে তুই প্রতি মাসে আমাকে সুদের টাকা ফেরত দিতে আসবি? সুতরাং বাইরে কোথাও খেটে যখন সুদের টাকাই শোধ করতে পারছিস্ না তখন আর আসলের কথা আলোচনা না করাই ভালো।"

শংকর—" মহারাজ, সুদের বদলে তো মজুর খাটবো, তা খাবটা কি?"

বিপ্রজী—"কেন, তোর বৌ-ছেলে কী করতে আছে? তারা কি হাত পা কেটে ঘরে বসে থাকবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোকে রোজ

সকালের খাওয়ার জন্য আধ সের করে যবের ব্যবস্থা করে দেবো। গায়ে দেবার জন্য বছরে একটা কম্বলও পাবি, এছাড়া একটা ফতুয়াও বানিয়ে দেবোখ'ন। আর কি চাই? একথা ঠিক যে অন্য লোক তোকে ছ'আনা রোজ মজুরী দেবে কিন্তু আমার তো তেমন কোনো গরজ নেই। আসলে তো আমি তোকে কেবল ঋণের টাকা কমানোর জন্য সুবিধে করে দিতে রাখলাম।"

শংকর বেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করে কাতর স্বরে বলে উঠলো, "মহারাজ, এত জন্মভর গোলামি করাই হলো।"

বিপ্রজী—"তা তুই এটাকে গোলামিই ভাব্ বা জন-মজুরিই ভাব্, আমি তোকে টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বো না। তুই যদি পালাস্ তবে তোর ছেলেকে শোধ দিতে হবে। তবে হ্যাঁ যখন কেউ থাকবে না তখন কথা অবশ্য আলাদা।"

সেই সময়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোথাও বিচার প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল না। জন-মজুরের হয়ে কে বলবে? শংকরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। সুতরাং সে পালিয়ে কোথায় যাবে? পরের দিন থেকে শংকর বিপ্রজীর ওখানে কাজ করা শুরু করে দিলো। সোয়া সের গম দান করার দৌলতে তাকে জীবন-ভর গোলামির শিকল পায়ে পরে নিতে হলো। এটা নিশ্চই তার পূর্ব-জন্মেরই ফল—এই বলেই ওই হতভাগ্য সেদিন তার মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ওর স্ত্রীকে যে কাজ কোনোদিন করতে হয়নি, সে কাজও এখন তাকে করতে হচ্ছে। ছেলেটা খাবারের জন্য বায়না করছে দেখেও শংকরের শুধু চেয়ে-দেখা ছাড়া করার কিছুই

থাকে না। সাধুবাবাকে গমের আটা খাওয়ানোর ফলে আশীর্বাদের বদলে দেবতার অভিশাপ আজীবন তার মাথায় চেপে থাকলো।

শংকর ওই বিপ্রজীর কাছেই বিশ বছর ধরে গোলামি করার পরে এই নিরানন্দময় পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়ে চলে গেছে। একশো কুড়ি টাকার দেনা তখনও তার মাথায় চাপানো ছিল। চতুর বিপ্রজী ঐ গরিব লোকটিকে ভগবানের দরবারে আর শাস্তি দিতে চাননি। তিনি এতটা বিবেকহীন বা এতটা নির্দয়ও নন। শংকরের মৃত্যুর পর তিনি ওর জোয়ান ছেলেটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে এলেন। আজ পর্যন্ত সেই ছেলে বিপ্রজীর কাছে মজুর খাটছে। কবে যে তার উদ্ধার হবে ? আদৌ হবে কিনা, একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন।

পাঠকগণ, এই বৃত্তান্তকে যেন লেখকের কল্পনাপ্রসূত না ভাবেন। এটি একটি সত্য ঘটনা। পৃথিবীতে খুঁজলে এই ধরণের বহু শংকর এবং এই ধরণের বহু বিপ্রজীর দেখা পাওয়া যাবে।

অনুবাদ ঃ **কৃষ্ণা গুহ।**

—০—

বনস্পতি

সোমেন চন্দ

এত বড় বটগাছ সচরাচর দেখা যায় না। পীরপুরের হাটকে যদি চিনতে হয়, তবে যে-কোন অশীতিপর ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেও, ইহার উত্তর মিলিবে। দূরে সে যত দূরেই হোক না কেন, যেন আকাশেরও প্রায় অর্ধেক ছাইয়া আছে, এমন একটা দৈত্যের মত প্রকান্ড গোলাকার গাছের দিকে দারুণ তৎপরতায় শীর্ণ হাতটি উঠাইয়া সে বলিবে, 'আরে তুমি কি কানা? ওই দৈত্যিটার বরাবর চলে যেতে পারো না?' যাহাকে বলা হইবে, সে যেন কোন ব্যবসায়ী, ওই হাটের দিকেই যাইতেছে, আর কোন উদ্দেশ্য তাহার নাই! পীরপুর

গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের মতো নয়, সেখানে কেউ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে পারে একথা কেউ ভুলেও কল্পনা করিতে পারে না। কেবল একটি হাট লইয়াই যেন সারাটি গ্রাম। কেবল সারি-সারি টিনে ছাওয়া ছোট ছোট ঘর, মাঝখানে সরু ক্ষত-বিক্ষত পথ, বটগাছের আশ্রয়ে চারিদিক চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন, হাটবার আসিলে রাত থাকিতেই নৌকার পর নৌকার ভিড় তারপর সারাদিন আর সারারাত কেবল জনসমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস। সেই কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় যাহাদের নাই, অথবা যে-কোন উপায়ে হোক সেই জনসমুদ্রের কিছুমাত্র আভাস যাহারা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে তেমন দৃশ্যের কল্পনা করা সুকঠিন।

আশেপাশে দশ-বারোটা গ্রাম হইতে পীরপুরের এই হাট চোখে পড়ে। সেই গ্রামগুলি আর এই হাটের মাঝখানে প্রায় দুইমাইলব্যাপী একখানা নদী আর সারি সারি অনেকগুলি বিল। বর্ষাকালে এই বিলগুলি আর নদীতে মিলিয়া, যে অবস্থা হয়, সেকথা মনে করিতে হইলে, কেবল কোন সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ওপারকে মনে হয় কোন রহস্যময়, কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবী, বিপুল রহস্যের ফেনা সারা গায়ে মাখিয়া এপারের পৃথিবীর সন্তানদের চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে ইহাও মনে হয়, আকাশের সীমারেখায় তাহা কোন ধূসরবর্ণের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাশি—অন্যান্য মেঘের মতো যাযাবর নয়। সেই দুই পারের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি আরও দুর্বোধ্য। সারাক্ষণ কেবল দুই পারের মানুষকে ভীষণ শাসাইতেছে। তারপর বাতাস বহিতে থাকে, বিশাল জলরাশিতে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত নৌকাগুলি সাদা এবং আরও নানারকমের রঙিন পাল মেলিয়া যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া আসিতে

থাকে, বটগাছের শত শত ডালের ভিতর রক্তের জোয়ার আসে, কোটী কোটী পাতা মৃদু কাঁপিতে থাকে। তারপর কোন একসময় হয়তো শীতের আবির্ভাব, মাথার উপরে কাঠফাটা রৌদ্র, সমুদ্রের বুক দেখা যায়, আর বটগাছের নীচে অজস্র শুকনো পাতার রাশি। একটা মুসলমান বুড়ী মাঝে মাঝে সেই পাতাগুলি ঝাঁট দিয়া নেয়।

প্রায় দুই-শ বছর আগে চলিয়া যাইতে হয়। তখন ১৭৫০ সাল। তখনো সমগ্র ভারতবর্ষের কেন, কেবলমাত্র বাংলাদেশের শাসনভারও জনকতক হিন্দু শ্রেষ্ঠীর চেষ্টায় ইংরেজ বণিকের হাতে চলিয়া আসে নাই তাহাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখনো প্রকৃত শাসন-প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে পারে নাই, এমন দিনে এক রাতে পীরপুরের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরী তাঁহার শয্যাসঙ্গিনী তৃতীয় পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বড় বিব্রত বোধ করিলেন। একটা ভয়ানক উত্তাপে এক মুহূর্তে কী জানি কেন সমস্ত শরীরটা তাহার দারুণ অবশ হইয়া আসিল, কেমন একটা অবসাদে ভরিয়া গেল, তিনি বড় অসহায় বোধ করিলেন, ইচ্ছা হইল দুই হাত দিয়া নিজের চুল ছিঁড়িতে থাকেন। অবশেষে গুটি-শুটি মারিয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন।

রাত তখন দুইটা। চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ, কোথাও টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। সামনে জানালা দিয়া বাগান হইতে তীব্র ফুলের গন্ধ আসিতেছে। বিছানায় বালিশের পাশেও নানারকম ফুল, কিন্তু নবকিশোরের কাছে তাহা এখন বিষের মতো মনে হইল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো, অথবা সুচের মতো তাঁহাকে বিঁধিতেছে। পাশেই অরুন্ধতী তাহার প্রখর যৌবন আর চেহারার দীপ্তি লইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে।

নবকিশোরের ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি ঘামিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তিনটা বাজিয়া গেল, হয়তো রাতকে দিন ভাবিয়া কয়েকটা কাক বাইরে কা-কা করিতেছে, কাঁটার বিছানায় শুইয়াও নবকিশোর একসময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার আশে-পাশে একদল নগ্ন নরনারী, চমৎকার তাহাদের চেহারা, যেন শ্বেত পাথরের খোদা মূর্তি, চমৎকার চোখ-মুখের ভঙ্গী, যেন অজস্র মাণিক ঝরিতেছে, নবকিশোর দেখিলেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহারা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছে, অজস্র চুমা খাইতেছে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কোন মেয়ের হাঁটুতে মুখ রাখিয়া কী সব বলিতেছে, কেহ বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—আর সেই একদল হাস্যমুখর, সৌন্দর্যদীপ্ত মানুষের মধ্যে তিনি যেন একটি ভেড়া! এমন সময় নবকিশোর হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন, অসহায়তার তুলনা তো নাই। শরীরটাকে আরও অবসাদগ্রস্ত বোধ করিলেন। ঘরের এককোণে বাতি জ্বলিতেছে, মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন : আশ্চর্য, বিছানা খালি, পাশে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী অরুন্ধতী নাই, ঘরের দরজা হা-হা খোলা, হু হু করিয়া শেষ রাত্রের ঠান্ডা বাতাস আসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া আসিল, তিনি খাট হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিলেন, আস্তে ডাকিলেন—'বৌ'?

কিন্তু কোন উত্তর নাই। শুধু তাঁহার গলাটাকেই এই নিস্তব্ধতায় ভীষণ বিকৃত শুনাইল। আবার আরও জোরে ডাকিলেন 'বৌ? বৌ?'

তবু কোন উত্তর নাই। নবকিশোরের প্রশস্ত কপাল আরও কুঁচকাইয়া আসিল, ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি এখানে সেখানে অরুন্ধতীকে খুঁজিতে লাগিলেন, বাগানেও অনেক খুঁজিলেন, পুকুরের ঘাটের কাছে গিয়া ডাকিলেন, 'বৌ? ও বৌ?'— কিন্তু অন্ধকারে কেবল প্রতিধ্বনিই ফিরিয়া আসিল। নবকিশোর ভাবনায় পড়িলেন। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছেলে সুরেন্দ্রকিশোরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আর সেখানে কোন মেয়েলী স্বরে কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যায়। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন, বুক তাঁহার দুরুদুরু কাঁপিতেছে। ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আর কোন সন্দেহ রহিল না, একবার উঁকি মারিয়া যা দেখিলেন, তাহাতে রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল।

পীরপুরের চৌধুরী পরিবারের ভাগ্যে আজ এ কী অভিশাপ, হায়, আজ এ কী দুরপনেয় কলঙ্কের ইতিহাস তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইল! তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী অরুন্ধতীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া প্রেমালাপ করিতেছে তাঁহারই একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর!

পরদিন অরুন্ধতী বা সুরেন্দ্র আর কাহাকেও ত্রিসীমানায় দেখা গেল না এবং পরেও আর কোনদিন দেখা যায় নাই। কেন এমন হইল, কিছুটা অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি এই যে, নবকিশোর নাকি অরুন্ধতীকে রূপকথার রাজাদের মতো মাটি চাপা না দিলেও এমন কিছু একটা করিয়াছেন যাহাতে সেই দুর্ভাগা মেয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুটা কল্পনা করিতে পারি এইরূপ:

মস্ত বড় দালানের যে দিকটা বেশ একটু নির্জন, আর গাছপালার ছায়ায় বেশ গম্ভীর, সেখানে একটা সুন্দর ঘর আছে। ঘরটি চমৎকার সাজানো মেঝেতে দামী ফরাস আর বালিশের ছড়াছড়ি, বাতাসে সুগন্ধ। চারিদিকে কেমন একটা নির্জন ভয়াবহতা, মাটিতে সূচটি পড়িলে শোনা যায়।

এই ঘরের এক বিপুল ইতিহাস আছে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে হইতে সেই ইতিহাসের সুরু। নবকিশোর তাঁহার সারা রাজ্য জুড়িয়া একটি জাল তৈরী করিয়াছিলেন, সেই জালে যে মেয়েগুলি ধরা পড়িত, তাহাদের ধরিয়া আনা হইত এই ঘরে—সকলের চোখেই পাগলের মতো দৃষ্টি, নয়তো নিতান্ত ছেলেমানুষ হইলে সারামুখ চোখের জলে ভেজা, মাথায় চুল আর পরনের কাপড় এলোমেলো, আত্মসমর্পণের ইচ্ছা মোটে না থাকিলেও আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট। নবকিশোর তাহাদের কোন কুলই রক্ষা করিতেন না, কেবল পথে বসাইতেন। সেই মেয়েগুলি তখন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, না হয় গ্রামের হাটে-হাটে কোন বিশেষ পল্লীতে আশ্রয় লইয়া বাঁচিত। এভাবে অনেক মেয়ের কুমারী অথবা বধূজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া নবকিশোর বিন্দুমাত্র বিব্রত হন নাই, তাহাদের অভিশাপ আর বেদনার রক্ত গায়ে মাখিয়ে তিনি এতটুকু বিচলিত হন নাই, বরং তাহাদের দেহ লইয়া বারবার ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, একদিকে সর্বনাশ করিয়া অন্যদিকে লাথি মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবকিশোরের সুদীর্ঘ জীবন, আর সেই জীবনের সঙ্গে জড়িত এই ঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। এখন সেই ঘর তত ব্যবহৃত হয় না, মেঝেতে ধুলি পড়ে। তার মূলে একমাত্র কারণ হয়তো

বার্ধক্যের অক্ষমতা এবং সেই কারণে আগের মতো প্রচুর উৎসাহের অভাব। কিন্তু সেদিন যে কান্ড ঘটিল তাহাকে সত্যই অদ্ভুত বলা চলে। ঘটনাটি গতানুগতিক পথ ধরিয়া ঘটে নাই। নবকিশোর সেই ঘরের কথা মনে করিয়াই স্ত্রীর জন্য উপযুক্ত শাস্তি খুঁজিয়া পাইলেন। অরুন্ধতী গাম্ভীর্যে ঘরে ঢুকিল, নবকিশোর বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত আর খুলিলেন না। অরুন্ধতী প্রথমে ধাক্কা দিয়াছিল, তারপর কাঁদিয়াছিল। বাগানের সেই নির্জন অংশ তাহার উচ্ছ্বসিত কান্নায় থম্‌থম্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতেও ক্লান্তি আসে, তাহার গলার স্বর একদিন আর শোনা গেল না।

এবং ইহার কয়েকদিন পরেই দেখা গেল নদীর পারে একটা চমৎকার খোলা জায়গা বাছিয়া সেখানে নবকিশোর দুটি বট অশথের চারা এক সঙ্গে পুঁতিয়া দিলেন, তারপর সেই গাছে অনেক সিঁদুর মাখাইয়া, নূতন কাপড় পরাইয়া বিরাট সমারোহে পূজা করিলেন, আশেপাশের বিভিন্ন গাঁ হইতে হাজার হাজার প্রজা আসিয়া তাঁহার সেই পূজা দেখিল, অজ্ঞাত নিরুদ্দেশ দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। ধূপের ধোঁয়ায় আর মানুষের কোলাহলে কত ছাগ-শিশুর চিৎকার আর কান্না শুনিয়াও শোনা গেল না, ধূসর মাটি রক্তে ভাসিয়া গেল, নবকিশোর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া 'মা' 'মা' করিয়া অনেক ডাকিলেন..... বট গাছের জন্মের ইতিবৃত্ত মোটামুটি এই। কিন্তু এটুকু জানিবার চেষ্টাও জনসাধারণের নাই. গাছের মধ্যে দেবতার অংশ আছে, ইহা জানিতে পারিয়াই তাহারা খালাস।

তারপর বিখ্যাত ১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলা অথবা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য নিরূপিত হইয়া গেল। বাংলার ধনীরা ইংরেজের জয়লাভের আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন।

অথচ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র কতো নিরীহ দরিদ্রের রক্তে ভাসিয়া গেল। পীরপুরের একটি ছেলেও যে হতভাগ্য সিরাজের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের পাতায় লেখা না থাকিলেও পীরপুরের ছেলে বুড়ো কে না জানে ?

তাহার নাম অর্জুন।

সেবার কোথা হইতে এক বাঘ আসিয়া সারাটা গ্রামে ভয়ানক উৎপাত সুরু করিয়া দিল, আজ এবাড়ীর ছাগলটা, কাল ও বাড়ীর বাছুরটা প্রায়ই পাওয়া যাইতে লাগিল না। বৃদ্ধ এবং শিশুরা ভয়ে ভয়ে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইত না, গভীর রাত্রে কোন গভীর সমস্যায় পড়িলেও কেহ ভুলেও দরজাটা একটু ফাঁক করিত না। হয়তো কখনো একটা বাছুর ভীষণ আর্তনাদ করিয়া উঠিত। গরুগুলি প্রত্যুত্তরে 'মা' -মা' করিয়া চিৎকার করিতে থাকিত, তার পরেই সব শেষ। এমন দৃশ্যের অভাব রহিল না। গ্রামের ভিতর একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল যে পথে বাঘের পায়ের ছাপের মত কিছু চোখে পড়িত, সে পথ আর কেহ মাড়াইত না। কিন্তু এই দুঃসময়েও অর্জুনের সাহস দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিল—বাস্তবিক এমন অসীম সাহসের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়। সে একদিন সেই দুর্ধর্ষ বাঘটাকে সকলের পায়ের সামনে আনিয়া হাজির করিল। ব্যপার দেখিয়া বৃদ্ধরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন এবং এমন ভবিষ্যৎবাণীও করিলেন যে, সে কালে একটা কিছু হইবে।

মেয়েরা আড়ালে থাকিয়া তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইল। আশে-পাশে দু-চারখানা গ্রামেও এমন বীরত্বের কাহিনী মুহূর্তের মধ্যে প্রচার হইতে বাকী রহিল না। এমন কি স্বয়ং জমিদার

মহাশয়ও দারুণ খুশি হইয়া কিছু পুরস্কার দিলেন তাহাকে। কিন্তু সকলের প্রশংসাবৃষ্টির আড়ালে অর্জুনের জীবনে আর একটি ব্যাপার যা ঘটিল, তার তুলনা নাই। অর্জুন প্রেমে পড়িল। তাঁহার অথবা সেই মেয়েটির প্রেমের আসরে নামিবার প্রথম দৃশ্যটি এই : রাজকুমার মন্ডলের বাড়ীর সামনেই একটা পোড়ো বাড়ীর উঠানে মরা বাঘটাকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। রোজই সেখানে কিছু না কিছু লোক জমিয়াই থাকিত। রাজকুমারের বড় মেয়ে চম্পক একদিন সেখানে গিয়া হাজির হইল, বাঘটার চারদিকে চরকির মতো কয়েকবার পাক খাইয়া, নাকে কাপড় দিয়া এখানে সেখানে থু-থু ফেলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা ভরে বলিল, 'বাঘের' গায়ে অমুন গন্ধ কেন ? এমুন কান্ড তো আর দেখি নাই জীবনেও। বাঘের গায়ে অমুন গন্ধ কেন ?

কাছেই ছিল অর্জুন। ব্যাপার দেখিয়া সে কিছুতেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসি থামিলে শেষে আবার দারুণ গম্ভীর হইয়া এমন একটা তুচ্ছ বিষয়ও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বুঝাইয়া দিল যে চম্পক তো অবাক ! এমন দরদভরা স্বরে কেহ অনেক কাল তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই। সে আরও তাহাকে দেখিয়াছে বটে কিন্তু ভালো করিয়া দেখে নাই. আজ নূতন করিয়া দেখিল, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীর আসিয়াছে. তাহার চুল এলোমেলো, মুখভরা হাসি, হাতে খোলা তরবারি আর ঢাল, এখন শুধু বরণ করিতেই বাকী। বীর যুবককে বরণ করিবার লোক এখন কোথায় ? চম্পক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কোন হরিণশিশুর মতো তাহার চোখের দৃষ্টি।

তারপর প্রেমের দ্বিতীয় দৃশ্যের কথাও বলিতে হয়। রাজকুমারের

বাড়ীতে একদিন কীর্তনের আয়োজন করা হইয়াছে, গ্রামের অনেকেই আসিয়া কীর্তনে যোগ দিয়াছে। অর্জুন আসিয়াছে! চম্পক আর স্থির থাকিতে পারিল না, চুপি-চুপি কখন কীর্তনের আসরের কাছে গিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে অর্জুনকে ডাকিল, অর্জুন আসিল—কিন্তু কাছে আসিলে পর চম্পক আর কিছু বলিতে পারে না, মাটির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা ভালো চম্পকের মাথায় ছিট্ আছে, সে 'হ্যাঁ' বলিলে মাঝে-মাঝে তাহার অর্থ হয় 'না'। 'না' বলিলে অর্থ হয় 'হ্যাঁ'। অনেক সময় ভুলেও সে চুল বাঁধিত না, আবার একসময় যখন-তখন চুল বাঁধিত। বছর চারেক আগে স্বামী তাহার জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। স্বামী জলে ডুবিয়া মরিলে স্ত্রীকে কপালে সিঁদুর মাখিয়া বারো বছর অপেক্ষা করিতে হয়, চম্পকও অপেক্ষা করিতেছিল। এখন বয়স তাহার সতেরো। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সে পাগলামি করিয়া এখানে সেখানে আছাড় খাইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল কিন্তু অর্জুনের ছায়ার আশ্রয়ে এই পাগলামি এখন অনেক কমিয়াছে। সে যেন নূতন পৃথিবীতে পা ফেলিল, জলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেরই এখন বিশ্বাস হয় না, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে, গাছের নীচে শুকনো পাতার মর্মর সে প্রাণ ভরিয়া শোনে।

খুব দ্রুত পদক্ষেপের মতো অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু একসময় বিদায়ের পালা আসে। একদিন চমৎকার সাজিয়া এক বিদেশগামী নৌকায় অর্জুন চড়িয়া বসিল। দূর হইতে দারুণ চোখের জলে ভিজিয়া চম্পক দেখিল, বীরকুমার আবার যুদ্ধে যাইতেছে, এবারও সে জয়লাভ করিবে নিশ্চয়।

নদীর মাঠ হইতে কিছুদূরেই সেই বটগাছ। এখন কিছুটা বড় হইয়াছে। পাতাগুলি কচি, চমৎকার, চক্‌মক্‌ করে। রোদ খুব তীব্র হইয়া উঠিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়া মাটিতে পড়ে। দু-একটি ডালের ভিতর দিয়া সুতার মতো সরু শিকড় বাহির হইয়া গিয়াছে। গাছের গোড়ার দিকটা সিঁদুরে লাল, আর সেই গোড়ার মাটিও প্রচুর দুধ আর তেল খাইয়া কালো রঙ ধরিয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, এই গাছের নীচে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহার চুল এলোমেলো—চোখ দুটি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল। সে চম্পক। চম্পক মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সেই দেবাংশী গাছের উদ্দেশ্য অনেক প্রার্থনা জানায়। বিড়বিড় করিয়া বলে, জয়ের মালা পরিয়া তাহার অর্জুন যেন শীগ্‌গিরই ফিরিয়া আসে, সে আবার তাহাকে বরণ করিয়া লইবে, তাহার বুকের ছায়ায় সেই বীরকে আশ্রয় দিবে। চম্পকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, স্তনের ভিতরও কেমন একটা যন্ত্রণা, দুই হাতে সে তাহার স্তন চাপিয়া ধরিল।

চম্পক নদীর পারে আসিয়া দাঁড়ায়, চোখ ছোট করিয়া বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া থাকে, চোখের দৃষ্টি কখনো ভাঙ্গিয়া আসিলেও সে নিজে কখনও ভাঙ্গে না, বর্ষায় ক্ষিপ্ত নদীর ঢেউ পারের উপর আসিয়া আছাড় খায়, বর্ষা যায় শীত আসে, শীত যায় আবার বর্ষা আসে,—তবু অর্জুন আসে না, বছরের পর বছর ঘুরিয়া গেল, বটগাছ আরও বাড়িয়া ডালপালা মেলিয়া মাটিতে দীর্ঘতর ছায়া বিস্তার করিল, গ্রামের কোথাও দারুণ জঙ্গলে ভরিয়া গেল, কোথাও মানুষের পদক্ষেপে পরিষ্কার হইল, গ্রামে আবার বাঘ দেখা দিল, অনেক ছাগল, বাছুর খাইল তবুও অর্জুন আসে না! পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার লড়াই করিয়া সে প্রাণ দিয়াছে।

নদীর পারে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে চম্পকের শরীরও একদিন ভাঙ্গিয়া আসে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। একদিন দেখা গেল, রাজকুমার মণ্ডলের মেয়ে চম্পক নদীর বিক্ষুব্ধ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, প্রাণপণে সে সাঁতরাইতেছে। নদীর ঢেউএর আঘাতে খোঁপা তাহার খুলিয়া গেল, জলের তালে তালে নাচিতে লাগিল, চম্পক সেই যে জলে নামিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

তারপর ১৭৬৯ সাল। সেবার বাংলার আকাশে এক গভীর দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আজও লোকে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে স্মরণ করে। এই সভ্যতার দিনে এক যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায়ে এমন প্রাণহানি ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। না খাইতে পাইয়া সেবার বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গেল। শুধু মরিয়া গেল বলিলে মৃত্যুটা বড় সহজেই শোনায় সেই মৃত্যুর দৃশ্যগুলি এত করুণ আর এত ভয়াবহ যে শরীরে কাঁটা দিয়া ওঠে। তবু অত্যাচারের সীমা নাই। তখন রাজস্ব আদায়ের যাহারা মালিক, তাহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে এবং পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে লোকে ঘর ছাড়িয়া পালাইল, স্ত্রী-কন্যা বেচিয়া খাইল, অথবা আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিল। সাধারণ কুকুরও সে দিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মানুষকে তাড়া করিতেছে। এমন দিনে পীরপুরের লোকগুলির অবস্থা কম ভয়ানক নয়। সারা গাঁয়ে দিনের বেলায়ও টুশব্দটি শোনা যায় না। কাহারো কোন কথা নাই, সকলেই কেবল একে অন্যের দিকে হাঁ করিয়া থাকে, তাহারা আজ কাঁদিতেও ভয় পায়। মাঝে-মাঝে কেবল কুকুরের কাতর ডাক শোনা যায়। কুকুরের ডাক

আজ মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। সেখানকার বৃদ্ধরা তখন কেবল তাহাদের দীর্ঘ, শীর্ণ আঙ্গুল দিয়া মাটিতে আঁক কষিতেছে, প্রৌঢ়রা আর কোন উপায় না দেখিয়া স্ত্রীর মাংসপিন্ডকেই জীবনের সার বলিয়া জানিল, যুবকেরা মাঠে মাঠে বেড়াইতেছে। মেয়েদের বেণী রচনায় আর সাধ নাই, কপালে টিপ দিতে আর পায়ে আলতা পরিতেও ইচ্ছা জাগে না।

একদিন এই দুর্ভিক্ষ পীড়িতের দল সেই বটগাছের নীচে আসিয়া সমবেত হইল, বড় বড় উস্কখুস্ক চুল ভরা অনেকগুলি মাথায় সেই খোলা জায়গাটি ভরিয়া গেল, সেই মাথাগুলি কোন গভীর প্রার্থনায় নতমুখী। দেবাংশী গাছের দিকে চাহিয়া তাহারা অনেক প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তারপর আরও অনেকগুলি বছর কাটিয়া গিয়াছে, প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি, এতদিনে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পীরপুরেরও। আগে যাহারা ছিল, এখন তাহারা নাই। এখন যাহারা আছে তাহারা আর একদল লোক। কিন্তু তাহাদের রক্তে একই মানুষের রক্তের প্রবাহ বহিতেছে। সেই বটগাছকেও আর চিনিবার জো নাই। একদিন যা ছিল নিতান্ত শিশু, সে এখন বড় হইয়া প্রকান্ড ছায়া বিস্তার করিতেছে। পাতাগুলি এত ঘন যে আকাশও অনেক সময় দেখা যায় না। এখানে সেখানে মোটা-মোটা শিকড়, মাটির রস পান করিতে অতৃপ্তি নাই। গাছের ছায়া এত নিবিড় যে গ্রামের ছেলেরা ইহার নীচে বসিয়া আড্ডা মারে, শীতকালে এখানে বসিয়াই আগুন পোহায়, ধোঁয়ায় তাহাদের মুখ ধূসর হইয়া আসে। এ ছাড়া গাছের নীচে দু-একটি ঘর উঠিয়াছে তার মধ্যে একটি একটি মুদি-দোকান।

এতদিন পীরপুরের এই বটগাছকে ঘিরিয়া কত ঘটনা ঘটিয়া গেল আরও কতো ঘটিবে কে জানে। এতকাল এইগাছ গ্রামের দুই পুরুষ দেখিয়াছে, আর দেখিবে।

১৮৫৭ সালে কানপুরে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ধীরে-ধীরে তাহা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল,বাংলায়ও সে ঢেউ আসিয়াছিল। সেই বিপ্লবের আগুন এত তীব্র হইয়াছিল যে শাসন-যন্ত্রের চাকাও নড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐতিহাসিক এমন কথাও বলেন, সেই বিপ্লবের যাঁহারা পরিচালক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর যা কিছুরই অভাব থাকুক আর নাই থাকুক, শৃঙ্খলার অভাব যথেষ্টই ছিল; তাই আজও আমরা ইংরেজের আমল দেখিতেছি। সেই বিদ্রোহের ইতিহাসকে আজও লোকে 'কালা-গোর'ার যুদ্ধ বলিয়া স্মরণ করে। বিদ্রোহ দমনের দৃশ্য তাহারা অনেক দেখিয়াছে বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না। তখন সিপাহীদের কুকুরের মত তাড়া করা হইত, তাহাদের প্রাণনাশের সমারোহ তখন খোলা আকাশের নীচেই হইত। অনেক ভারতবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

একদিন একটা সিপাহী পীরপুরের বটগাছে আসিয়া আশ্রয় লইল। সে যেন কোন পলায়নপর সিংহ, পালাইতেছে বটে, কিন্তু তবু তাহার চোখদুটি জ্বলে জ্বলে করে। মুখের রঙ গৌর, পেশীবহুল শরীর, হাত-পায়ে অপরিষ্কার কাদামাটির দাগ, পোষাক ক্ষত-বিক্ষত, লোকটা একটা দিন সেই গাছের উপর লুকাইয়া রহিল। দুই একজন যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে, অনেককাল

ভুলিতে পারে নাই, সে ওই ভাবে পালাইয়াও অত্যাচারীর হাত হইতে রেহাই পাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

তারপর আরও কয়েকটা বছর কাটিয়াছে। চিরকাল একই রকম যায় না। গ্রামে একবার ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। এমন একটি ঘর রহিল না যেখানে অন্তত একটিও বসন্তের রোগী নাই। প্রায় কোন রাত্রিশেষে বা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন-ঘন হরিধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। নদীর পারের জল আর আকাশ শ্মশানের অগ্নিশিখায় লাল হইয়া গেল।

এমন চরম অসহায়তার দিনে গ্রামের অধিষ্ঠিত দেবতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর উপায় নাই। গ্রামের সকলে আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিল গাছের নীচে, প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কী কারণে দেবতা রাগ করিয়াছেন কে জানে। সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া দেবতার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিল, 'হে দেবতা, ক্ষমা করো। কোনদিন না বুঝিয়া কী ভুল করিয়া ফেলিয়াছি, তুমি পিতা হইয়া তাহা ক্ষমা করো।'

দেবতার পায়ের কাছে শত শত পাঁঠা বলি দেওয়া হইল, মাটিতে রক্তের নদী বহিয়া গেল। দেবতাকে একবার রাগাইলে আর উপায় নাই, অনেক মূল্য দিয়া তবে সেই রাগ থামাইতে হয়। এমন অনেক বিপদ-আপদে যিনি পাশে আসিয়া দাঁড়ান তাঁহাকে মাঝে মাঝে খুশি না করিলে চলে না।

এদিকে দিনের পর দিন কাটিতে থাকে। আজ যা অতি আড়ম্বরে ঘটে, কাল তা মনেও থাকে না। কিছুই ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

ধীরে ধীরে দেশে বণিকদের নিজেদেরই প্রয়োজনে রেলপথের বিস্তার হইতে লাগিল। তাহাতে সাধারণ লোকেরও কিছু উপকার হইলে বটে কিন্তু সেই কিঞ্চিৎ উপকারের বদলে যতখানি অপকারের অভিশাপ আসিয়া দেখা দিল, সেই কারণে শুধু মালিকদেরই দোষ দেওয়া চলে। একটা যন্ত্রের কাছে যখন একটা ভয়ানক সুখের আশা করা অন্যায় নয়, সেখানে এই অভিশাপের ইতিহাস বড়ই করুণ। দেখা গেল, প্রতি ঘরে ম্যালেরিয়া বিরাজ করিতেছে এবং তাহার প্রতাপে প্রত্যেক মানুষকে হাতের মুঠায় প্রাণ লইয়া ফিরিতে হয়। এমন কি ইহাতে শংকরও গ্রামের সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা অভাবনীয় হইলেও অস্বাভাবিক নয়।

সম্প্রতি চোরের মত চুপি-চুপি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সাদা কাপড় পরণে কে একটি মেয়ে প্রায়ই কোন নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে সেই বটগাছের নীচে আসিয়া মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে থাকে। খোঁজ করিলে জানা যায়, সে শংকর ভুঁইমালীর স্ত্রী সুকুমারী।

শংকর তো এই সেদিনও সশরীরে বাঁচিয়া ছিল। তাহার মত জোয়ান শরীর হাজারে একটা মেলে। সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। এ ছাড়া ঘর তৈরী করিতে এমন ওস্তাদ এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নাই। সেদিন সে গিয়াছিল মাধবদি'র হাটে, সন্ধ্যার কিছু

পরে হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল. বলিল 'বৌ, একটা কাঁথা দে, জ্বর আইল বুঝি।'

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'আবার কী সর্বনাশ আইছে কে জানে।' তোলা একখানা কাঁথা বাহির করিয়া সে শঙ্করের উত্তপ্ত শরীরে তাড়াতাড়ি বিছাইয়া দিল। হাত দিয়া কপাল পরীক্ষা করিয়া বলিল. 'ওগো-মাগো গাও যে পুইড়া গেল !'

জ্বরের ঘোরেও শঙ্করের দুষ্টামি বুদ্ধি যায় না। তাহার হাতখানা সরাইয়া সে বলিল, 'এমনে জ্বর দেখে না।'

'কেমনে ?' সুকুমারী তাহার কপালে নিজের গাল রাখিয়া বলিল, 'এমনে ?'

শঙ্কর তাহার গরম ঠোঁট দুটি সুকুমারীর ঠাণ্ডা গালে ঘষিয়া জড়িতস্বরে বলিল, 'হুঁ।'

সুকুমারী হাসিয়া ফেলিল, তাহার গালে মৃদু একটা চড় মারিয়া বলিল, 'এই বুঝি জ্বরের রুগীর মতন কথা ?'

তারপর জ্বর আরও বাড়িয়া চলিল ! সেদিনের রাত্রিটা মোটামুটি ভালোই গিয়াছিল। সুকুমারীকে বেশী জাগিতে হয় নাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ভালোই গেল। চারদিনের দিন বিছানা হইতে উঠিয়া শঙ্কর বলিল, 'বৌ, তাড়াতাড়ি ভাত বসাইয়া দে, আমি আজই ভাত খামু।' শঙ্কর সত্যই স্নান করিতে চলিল। ব্যাপার দেখিয়া সুকুমারীর দুই চক্ষু স্থির। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'এমন করলে আমি

গলায় দাঁড় দিয়া মরুম। তাড়াতাড়ি যাও, শুইয়া থাক গিয়া, জ্বর অহনও ছাড়ে নাই।'

শঙ্করের স্বভাবটা চিরকালই এমনি। কেবল সুকুমারীর আশ্রয়েই সে যেন মানুষের মতো চলিতে পারে, নইলে কোথায় যে ভাসিয়া যাইত কে জানে!

মারা যাওয়ার আগের দিন এক কাণ্ড ঘটিল। রাত্রি তখন অনেক শঙ্কর হঠাৎ চোখ মেলিয়া ডাকিল, 'বৌ' ?

সুকুমারী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'কও ?'

শঙ্কর আবার ডাকিল, 'বৌ ?'

সুকুমারী বলিল, 'কী ? কও না গো ?'

শঙ্কর তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলিল, 'উঁ।'

সুকুমারী তবু বুঝিতে পারে না, সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, 'কী অইছে গো ?'

তবু তাহার কোলের ভিতর মুখ গুঁজিয়া শঙ্কর গোঁগাইতে থাকে, বিড় বিড় করিয়া একমনে কী বলে।

কী একটা কথা মনে হওয়ায় সুকুমারী হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার মুখটি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—ছিঃ, এমুন পোলাপানের মতন করে না। তোমার যে জ্বর গো!'

শঙ্কর বলিল, 'না, জ্বর না, আমার জ্বর না।'

—'তুমি একটা পাগল। গাও পুইড়া যায় জ্বরে, তবু—,'

সুকুমারী কী করিবে ভাবিয়া পায় না, তাহাকে আরও জড়াইয়া

ধরিয়া তাহার মুখের কাছে নিজের মুখটি লইয়া সে বলিল, 'এই লও, খালি চুমা দাও।'

কিন্তু শঙ্কর তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল, একেবারে পাশ ফিরিয়া শুইল। এবং পরদিনই সে মারা গেল।

সুকুমারী ইহার পর আর কী করিতে পারে? ঘরের এককোণে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিতে-কাঁদিতে চোখমুখ তাহার ফুলিয়া গেল, কেবলই মনে হইতে লাগিল, মৃত্যুর আগে শঙ্কর কী একটা জিনিস তাহার কাছে চাহিয়াছিল।

অথচ সে দেয় নাই, হায়, সে কেন রাজী হয় নাই? এমন কঠিন কিছু নয় তো সে কিছুতেই দেওয়া চলে না, হায়, কেন রাজী হয় নাই সে! কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারীর যে দমবন্ধ হইয়া আসে, আর ভাবিতে পারে না সে।

ইহার পর হইতেই তাহাকে অনেক নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে সেই দেবাংশী বটগাছের নীচে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে দেখা যায়। এমন সাদা কাপড় পরা একটা মূর্তিকে হঠাৎ দেখিলে মনে প্রথমে ভয়ই জাগে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ভুল ভাঙে। একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসিতে থাকে এবং তখন মনে হয়, ঐ সাদা কাপড় পরা মেয়েটি শঙ্করের সদ্য বিধবা স্ত্রী সুকুমারী ছাড়া আর কেহ নয়।

তারপর আরও অনেকগুলি বছর কাটে। অনেক পরিবর্তন এবং তার দ্বিগুণ সম্ভাবনা লইয়া বিংশ শতাব্দী দেখা দিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে চেতনা আসিল,

সুরেন্দ্রনাথ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অনেক যুবক তাঁহার গাড়ী টানিয়া কৃতার্থ বোধ করিল। তারপর পৃথিবীতে মহাসমর বাধিতেও আর বাকি থাকে না। ভারতবর্ষে সেই যুদ্ধের যাহারা প্রতিবাদ করিল তাহারা জেলে গেল, আর যাহারা করিল না তাহারা এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল যে যুদ্ধের পর কিছু পাওয়া যাইবে।

কিন্তু বাহিরে যাহাই ঘটুক, পীরপুরে তার ছোঁয়াচটুকুও লাগে না, সে তাহার বটগাছের মতই নির্বিকার নির্বিকল্প।

এমন সময় এক সুদর্শন সুবেশ ভদ্রলোককে পীরপুরের নদীর ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে নামিতে দেখা গেল। তিনি এ গাঁয়ের বিশিষ্ট জামাই; বছর বছর স্ত্রী বাপের বাড়ী আসিলে তিনিও বছর বছর আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার হাতে কী একখানা কাগজ, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি তাহা পড়িতেছিলেন, নৌকা পারে লাগিতেই আবার গুটাইয়া লইলেন এবং লাফ দিয়া পারে নামিয়া পড়িলেন। কিছু দূরের বটগাছের নীচে পনরো ষোল বছরের এক বালক গভীর মনোযোগে ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে এ গাঁয়ের ছেলে। ভদ্রলোক কাছে আসিতে সে তাঁহার দিকে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল, ভদ্রলোকও হাসিলেন। তারপর সে তাঁহার পিছু লইল।

ভদ্রলোক ডান হাতে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যে বাড়ীতে গিয়া প্রথম ঢুকিলেন, সে বাড়ীর অবস্থা মোটের উপর ভালোই। তাঁহাকে দেখিয়া কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'জামাইবাবু' 'জামাইবাবু' বলিয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে এক প্রৌঢ়া মহিলা ঘর হইতে

বাহির হইয়া আসিলেন। এবং আরও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, বাকারির বেড়ার ফাঁক দিয়া আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়েও চুপি চুপি চাহিয়া কী দেখিতেছিল।

সেই ছেলেটি হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল 'মৃণালদি' জামাইবাবু এসেছেন। আমি না বলেছিলাম আজ আসবেন?'

মৃণাল হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, সতু, বলেছিলি।'

ওদিকে জামাই-বেচারীকে নানারকম আদর-যত্নে রীতিমতো ঘায়েল করা হইতেছে।

একসময় চুপি চুপি সেখানে গিয়া সতু কাগজখানা খুলিয়া বসিল। কাগজখানা একটি পত্রিকা। সতু প্রথমে দেখিল, কোন এক জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক জায়গায় এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, বড় বড় অক্ষরে তারই বিশদ বিবরণ দেওয়া। কয়েক হাজার লোকের একটা মিটিং হইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল চারিদিকে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা সেই বিপুল জনমণ্ডলীর চারিদিকে ঘিরিয়া নির্মমভাবে গুলি চালাইল। চার-শ' লোক সেখানেই মারা গেল, এছাড়া আরও কত লোক যে শুধুই আহত হইয়াছিল, তার ইয়ত্তা নাই।

ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। পড়িতে পড়িতে সতুর গা-জ্বালা করিল, কখনো মুষ্ঠি দৃঢ় হইল, এমন কি সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এবং ইহার কয়েকবছর পরেই দেখা গেল, এক শুভ অপরাহ্নে

গ্রামের একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পত্রিকা পাঠক শ্রীযুক্ত মনোহর চক্রবর্তী সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া শুধু এই কথাই প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে তাঁহাদেরই পীরপুরের গাঁয়ের রাজেন মিত্তিরের ছেলে সতীন মিত্র শহরের কোন এক সাহেবকে মারিতে গিয়া নাকি ধরা পড়িয়াছে।

ঘটনা সত্য সন্দেহ নাই।

বটগাছের নীচে আশে-পাশে এমনি আরও অনেক ঘটনা ঘটে। মানুষের মতো দুটি চোখ থাকিলে অনেক কিছু সে দেখিত। সে এখন বৃদ্ধ। তার গায়ে এখানে ওখানে কেবল নানারকমের শিকড়, কোন কোন ডালে হয়তো পোকাও ধরিয়াছে। গাছের গুঁড়িটা এত মোটা যে কয়েকটি লোক মিলিয়াও নাগাল পাইবে না। গুঁড়ির কাছে চারিদিকে কে যেন বাঁধাই দিয়াছে। গাছের নীচে প্রকাণ্ড বড় ছায়া এবং সেই ছায়াকে জড়াইয়া আরও বড় একটা বড় একটা হাট বসে। ছোট ছোট টিনের ঘরের সারি এত বেশী এবং ঘন যে হাঁটিবার পথও পাওয়া দুষ্কর।

এখন ১৯৩০ সাল। গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সেই আগুনের ঢেউ পীরপুর গ্রামেও কিছুটা আসিয়া পেঁৗছিল। একদিন কোথা হইতে একদল যুবক আসিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহাদের সঙ্গে ছোট একটা হারমনিয়ম। তাহারা স্বদেশী গান গাহিয়া বিলাতিবর্জনের কথা বলিয়া কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করিল।

লোকগুলি সকলের কাছেই এক অদ্ভুত রহস্যময় জীব। মেয়েরা চুপি চুপি বিস্ময়ভরা চোখে এই সুদর্শন যুবকদের দেখিল।

বিকালে বটগাছের নীচে এক সভা। অনেক লোক আসিল। দেখা গেল, কয়েকটি স্ত্রীলোকও সন্তান-সন্ততি সহ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে। তাহারা এক হাতে ঘোমটা টানিয়া স্বদেশী বক্তৃতা শুনিল। সভায় সভাপতিত্ব করিলেন শ্রেষ্ঠ পত্রিকা পাঠক মনোহর চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে সব অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন তাহা সমবেত সকল লোককে শুনাইলেন। একজন শুধু বন্দেমাতরম্ শব্দেরই ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব মন্ত্র আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে মুখে ফিরিতেছে বটে কিন্তু ইহার অর্থ অনেকেই জানে না। ইহার অর্থ হইল হে মাতা, তোমাকে বন্দনা করি।'

এছাড়া সেই যুবকদের মধ্যেও দুই একজন বক্তৃতা দিল।

তারপর একেবারে ১৯৩৯ সাল। বটগাছের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ দেখিতে বড় ভয়ানক। কতকগুলি ডাল এখন একেবারে জীর্ণ, পত্রহীন, ছোট-ছোট ডাল আর শুকনো পাতা সর্বদা ঝরিয়া পড়ে, এক মুসলমান বুড়ী তা কুড়াইয়া লয়। গাছের গুঁড়ির দিকে একটা মস্ত বড় গর্তের মতো, একটা লোক বেশ লুকাইয়া থাকিতে পারে! হাটবারে চারদিকে বাঁধানো জায়গাটিতে অনেকে দোকান সাজাইয়া বসে, অনেকে বেশ আড্ডা মারে, কেহ কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াও খায়। মাঝে মাঝে দুই একজন সাধুও বসে।

যেদিন হাটবার, সেদিনের অবস্থা দেখিলে এতকালের ইতিহাসকে ভুলেও মনেও করা যায় না, দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, একটা ভীষণ কোলাহল চাঁদোয়ার মতো সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে গম্-গম্ করিতে থাকে।

সেদিনও হাটবার। রাত থাকিতেই নানারকমের নৌকা আসিতেছে। একটার পর একটা করিয়া প্রায় আধমাইলখানেক নদী সেই নৌকায় ভরিয়া গেল। বেলা বারোটার পর হাট বেশ জমিয়া ওঠে। চারিদিক লোকে গিজ্ গিজ্ করে। বাহির হইতে যাহারা আসে তাহাদের চেহারা দেখিলেই বোঝা যায়। তাহাদের গায়ে নানারকমের জামা থাকে। ভিড় কোথাও পাতলা বলিয়া মনে হয় না। সব জায়গাতেই সমান। পীরপুর অথবা অন্যান্য গ্রাম হইতে যাহারাই হাট করিতে আসিতেছে তাহাদের প্রত্যেকেরই কাঁধে গামছা, আর একটি ঝাঁকা। সকলে আসিয়াই একেবারে হাট করিতে বসিয়া যায় এমন নয়, অনেকক্ষণ এখানে সেখানে গল্প করিয়া সকলের শেষে তবে হাট করে। এইদিনে কতো পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ফুলুরি, বেগুনি, জিলিপি—এসব যাহারা ভাজে, তাহাদের কথা বলিবারও অবসর নাই, কারণ সকলেই একটি পয়সার অন্তত কিনিয়া যায়।

হাটের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ, যা অন্যদিন পাওয়া যায়না।

ছোট ছোট রাখাল ছেলেরা সস্তা সিগারেট কিনিয়া নির্ভয়ে খাইয়া বেড়াইতেছে! নূতন বিবাহ করিয়াছে যাহারা, অথবা যাহাদের কাছে তাহাদের স্ত্রীর গায়ের স্বাদ আজও পুরানো হয় নাই, তাহারা বেশীর ভাগই

যেখানে গোলাপী রঙের সাবান, চিরুণী ইত্যাদি বিক্রি হয় সেখানে ভিড় করিয়া আছে। গ্রামের একমাত্র খলিফা রহমান তাহার বহু পুরানো সেলাইর কলখানা একেবারে হাটের মাঝখানে লইয়া বসিয়াছে। কতো লোক তাহাদের লুঙ্গি সেলাই করাইয়া লইল, কেহ কেবল জামার ছেঁড়াটুকু তালি দিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময় এক কান্ড ঘটিল। সকলে দেখিল বটগাছের নীচে বাঁধানো জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া একটা লোক বক্তৃতা করিতেছে। লোকটা সেই সতীন মিত্র ছাড়া আর কেহ নয়। আজ নয় বছর পরে কী কারণে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া কয়েকমাস হইল সে গ্রামে আসিয়াছে। আসিয়াছ সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে দারুণ মিশিতে লাগিল, তাহাদের লইয়া কী জটলা করিতে লাগিল। আজ আর হঠাৎ দেখা গেল, ঐ বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া সে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার পাশে আর নীচে অনেকগুলি কৃষক। আস্তে আস্তে অন্যান্য কৃষকরাও একটা কৌতূহলবশে সেখানে গিয়া ভিড়িল, একটা বিপুল জনতার সৃষ্টি হইল।

সতীন বলিতেছিল : 'আমার চাষী-ভাইরা চেয়ে দেখুন, সব জিনিসেরই দর বেড়েছে কিন্তু যা বিক্রি করে আমরা দুটি খেয়ে বাঁচবো, সে সব জিনিসের দর বাড়েনি ! কেন এমন হলো ?'

সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। হায়দরের ছেলে বসির সতীনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

সতীন আবার বলিতেছে : 'ভাইসব, সমাজের যারা পরগাছা যারা

আমাদের গায়ের রক্ত শুষে শুধু বসে খায় তাদের উপড়ে ফেলবার দিন এসেছে আজ। ভাইসব, আমাদের জিনিস দিয়েই ওরা মোটর হাঁকায় ব্যাংকে লাখ, লাখ টাকা জমা রাখে, কিন্তু আমরা না খেয়ে মরি। এ অত্যাচার কেন আমরা না খেয়ে সহ্য করবো ? কেন সহ্য করবো ? এমন সময় আর এক কান্ড ঘটিল। হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি পড়িয়া গেল। লাঠি হাতে মস্ত জোয়ান একদল লোক বাঁধানো জায়গাটিতে উঠিয়া অনবরত লাঠি চালাইতে লাগিল।

দুই-এক ঘা খাইয়াও সতীন চীৎকার বলিল, 'ভাইসব এদের চিনে রাখুন, এরা সেই জমিদারদেরই ভাড়াটে গুন্ডা, লাঠি চালিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে এসেছে !'

সতীন আর বলিতে পারিল না, আরও কয়েকটা লাঠির ঘা খাইয়া বসিয়া পড়িল, রক্তে তাহার শরীর ভাসিয়া গেল, যে মাটি একদিন সিঁদুর আর শত শত পাঁঠার রক্তে লাল হইয়াছে, তা আজ মানুষের রক্তে লাল হইয়া গেল।

এক মুহূর্তে যা ঘটিয়া গেল, তা কল্পনাও করা যায় না। ব্যাপার দেখিয়া যে যার মতো পালাইল। আর যাহারা সেই প্রকান্ড, বৃদ্ধ এবং জীর্ণ বটগাছের অত বড় হাটের মাঝখানে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া রহিল, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই।

*   *   *   *

ইহার কয়েকদিন পরেই এক ভীষণ ঝড় আসিল, এমন ঝড় এ-অঞ্চলে ইদানীং আর হয় নাই। ঝড়ের ঝাপটা মৃতপ্রায় বটগাছের উপরেই লাগিয়াছিল বেশী। বটগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য ধরাশায়ী হইল। আর যেটুকু বাকী ছিল; তাহাও কাটিয়া লওয়া হইল। দেবাংশী গাছের কাঠ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যবহার করে না বটে, কিন্তু স্থানীয় জমিদার উহা বেচিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করিলেন।

দীর্ঘ দুইশ' বছর পরে বটগাছ অবশেষে মারা গেল। ইহার নীচে অনেক ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কতো দীর্ঘশ্বাস, চাপাকান্নার শব্দ ইহার প্রতিটি পাতার নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত; ইহার নীচে কতো লোক চাপা পড়িয়াছে, তারপর এক রক্তের গঙ্গা বহিয়া গেল, এখনও কত রক্তের বীজ ছড়াইয়া আছে, সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে, তারপর অনেক নূতন বৃক্ষ জন্ম লইবে ইহাও আশা করা যায়।

—০—

ছেঁড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকেলে বুড়ো ছেঁড়া মাদুরে বসে ঝিমোয়। একেলে বুড়ো তার সামনে একগাদা বই খাতা নিয়ে বসে থাকে গোমড়া মুখে। ছেঁড়া প্যাকিং কাগজের মলাট দেওয়া ইংরেজী বাংলা অংক ইতিহাস ভূগোল।

ইংরেজী পড়াবি না ইংরেজী? ভাল করে ইংরেজী পড়। বেশী করে পড়। ইংরেজী ভাল করে জানলে বাস্।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঝিমানো কথা, তবু প্রত্যাশা ও উৎসাহ বেশ আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পড়ন্ত রোদ কালচে খড়ের জীর্ণ চালায়

রংটুকু হারিয়ে সিক্ততায় চিকচিকিয়ে কাঁদছে। পচার চোখ চকচক করে উঠেছিল ভেজা গাছপালার দিকে চেয়ে, ওই আড়ালের ওপারে খেলার মাঠের কাদা, নদীর ধারের পিছল তীর। শ্রান্তিতে মিইয়ে যায়, মুখের ভাব, বসার ভঙ্গি। সারাদিন স্কুল করে এসে আবার পড়া তৈরী করা, দিনের আলোয় যতক্ষণ পড়া যায়। ভাঙা লণ্ঠন জ্বলবে না সন্ধ্যার পর। কেরোসিন নেই। কিন্তু খেলাধুলাও যে চলবে না সন্ধ্যার পর, তা কি ভাবে দাদু, মামীমা জানে।

ইংরেজী পড়, ইংরেজী শেখ। ইংরেজী একটু জানলে, বাস, আর ভাবনা নেই। রাখাল দুটো ইংরেজী কথা কইতে শিখেছিল ফাষ্টোবুক পড়ে, কলকাতায় দালান রেখে গেছে। বোকাসোকা ছিল তবু। ভাঙা ভাঙা ঝিমানো কথা, তবু প্রত্যাশা ও ঈর্ষার সুর মেলে। বাঁধা বলদটা হাড় পাঁজরায় ধুকছে উঠোনের কোণে কাদা গোবরে দাঁড়িয়ে, নিজেকে গুতুচ্ছে থেকে থেকে পোকা মাছির জ্বালায়। আগামী চাষের আয়োজনে লাঙল টানার জন্য ওকে পুষতে হবে দিন মাস ধরে, এবারের কাজ ওর সারা। ও বছরের কুমড়ো মাচাটি ফাঁকা, লিকলিকে লাউ চারাটি সবে উঠেছে মাচাতে। অনেক কুমড়ো দিয়ে গেছে গাছটা। ফুল আর ডগাও খাইয়েছে অনেক। কোথায় যে গেল তার চিহ্ন!

পড়তে বলছি না? চুপচাপ বসে রয়েছিস?

হাতড়ে কঞ্চিটা খুঁজে নিয়ে সেকেলে বুড়ো সপাৎ করে বসিয়ে দেয় পচার পিঠে, মুখবিহীন গোল যে ফোড়াটা বড় হয়ে উঠছে সেটাকে প্রায় ছুঁয়ে।

ফুলু সুখী হয় তার চিৎকার শুনে। বুড়োটা মেরেছে পচাকে, বুড়ো চটেছে পচার ওপর। এই তার অস্থায়ী একটু অবসর ছোঁড়াটাকে দুটো গালমন্দ শাপমন্যি দেবার। বুড়ো চটেছে, কিছু বলবে না। নাতিকে গাল দিতে শুনেও।

চেঁচাল কেনে ষাড়ের মতো? মরণ হয় না! ঘরের পক্ষি তাড়াবে চেঁচিয়ে। মরণ নেই! টেনে নিতে পারে না বাপে মায়ে যেথা গেছে?

ননদ পো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সংসারে বাপ মাকে খেয়ে। খাওয়া পড়া দিয়ে রেহাই নেই, ইস্কুলে পড়ছেন। বই খাতা কাগজ পেন্সিল, মাস গেলে মাইনে, কত কি। বুড়ো দেয় বটে খরচা, কিন্তু কেন পয়সা ঢালবে বুড়ো ওর পিছনে? ওকে দিতে না হলে তো সংসারে দিত।

দিত কি? গায়ের জোরেই মনকে বলাতে হয়, দিত, দিত, নিশ্চয় দিত। মনকে এই কথা বললে জোর থাকে না জ্বালার আশা থাকে না মরণ কামনা ফলবে।

মা, ওমা মা! খিদে পায় যে, ওমা, মাগো? ... ...

নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে শুনু পিছন থেকে ছেঁড়া পচা কাপড় চেপে ধরে। ওকেও মরতে বলার ঝোঁকে দমক মেরে ঘুরতে যেতেই পাছার কাছে ফেঁসে গেল জ্যালজেলে কাপড়।

খা! খা! খা! মোকে খা! পাঁজর-ভাঙ্গা মরণকান্না ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে। বুড়ো বেঁচে থাক, পচা সুখে থাক, তার কেন মরণ হয় না ভগবান। দিনে রাতে সাপের ছোবল আর সয় না।

হেথায় কেন গোল কর শুনুর মা। পচা পড়ছে। ইংরাজী পড় পচা। চেঁচিয়ে পড়।

উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ঝমঝমিয়ে। গলগল করে উগলানো ধোঁয়া পিছনে পড়ে থাকছে গুমোট মড়ার মতো এলিয়ে। দখিণ কোণে দূরের ওই লোহার চোঙ্গা থেকে ধোঁয়া সোজা উপরে উঠছে আকাশের নাগাল পেতে। ওর কাছে ষ্টেশান-টাতে থেমে এসে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

কোঠা বাড়ীর মনাবাবুর বৌটা কলেরায় মারা গেছে পরশু, ট্রেনে কি মনাবাবু আজ এলো? এতদিন আসেনি, বৌ মরেছে খবর শুনে আসবে নিশ্চয়। ছেলেটা হল দেড় বছরের, গা ভরা ঘায়ে কি কণ্ট ওইটুকু কচি ছেলের।

শুনুর বাপও যদি আসে এই গাড়িতে! বৌটা তার মরেনি, জল-জ্যান্ত বেঁচে আছে মরে যাওয়া উচিৎ হলেও, তবু যদি এখনি আসে, হঠাৎ কোন মনের খেয়ালে আসে চার ছ'মাস আসেনি বলে। যদি নিয়ে আসে রেশনের একজোড়া নতুন শাড়ি, রঙীন একটি সায়া, টুকটুকে লাল কি বেগুনি রঙের। আর সস্তা সাদা গোছের ঘি, পাঁপর, চানাচুর লেবেঞ্চুস—

ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে। একটা, দুটো তিনটে। ছিঁড়ে দিয়ে গেল সব স্বপ্ন, মাখিয়ে দিয়ে গেল সাধ। বুক দুরু দুরু করে ফুলুর। এখানে উনুনের সামনে বসে সে দেখতে পায় বড় প্রকান্ড জোড়া চাকা রাস্তায় খাদগুলির জল কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে। কানাই আর নিধুর দুটো ঘর ডিঙিয়ে জল কাদা যেন ছিটকে এসে তার গায়ে লাগবে এখানে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে পচা বুড়োকে শুনিয়ে। একটা পাখি শিস দিল এই ঘর ছোঁয়া আমগাছটার ডালে। আমের সোয়াদ এবারও জিভে লাগল না, এবারও তিনটে গাছই বুড়ো জমা দিয়েছিল রামশরণকে। একটা গাছ রাখ নিজেদের জন্যে, ওই বর্ণচোরার গাছটা, সবুজ-কালো আমগুলিতে যেন মধু পোরা, কি রঙ আর কি মিষ্টি গন্ধ। তা নয়, সবগুলি গাছ বুড়ো জমা দিয়েছিল। নাতিকে পড়াবে, ইস্কুলে পড়াবে। মরণ হয় না।

কাঠ কুড়িয়ে ফিরল বুঝি পিসি, ভিজে কাঠ পাতা আজ আর জ্বলছে না। এখনো বেলা আছে, আর খানিকক্ষণ খুঁজে-পেতে আর কটা বেশি শুকনো ডাল, ঝোপটোপ আনা পোষাল না পিসির, দুবেলা খাবার মুখটা আছে।

পদ্দী আবার চেঁচাচ্ছে। অবেলায় কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে জ্বরটা বাড়ছে আবার। আর কাঁথা নেই চাপা দেবার। যেমন বুদ্ধি বুড়োর, এত বড় মেয়েকে পার না করে ঘরে রেখে পুষছে। শুনোর বাপেরও যেন কোনো চাড় নেই বোনটাকে পার করবার।

পই পই করে সে বলেছে শন্নুর বাপকে, ফের এ বর্ষায় জ্বরে পড়লে যা ছিরি হবে মেয়ের, পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কেউ আর ছোঁবে না তখন। সেরে উঠে ফের একটু মানুষের মতো দেখাতে আরও ছ'মাস এক বছর। তা কে শোনে কার কথা! মরে যদি যায় তো অবিশ্যি আর — সেই আশায় আছে নাকি বুড়ো আর শন্নুর বাপ? যাকগে বাবা থাক্, তার অত ভাবনার দরকার কি। নিজের জ্বালাই বলে তার সয় না। দিনরাত শত বিছায় কামড়ায় আর ছোবল দেয় সাপে।

মা, ওমা, মা, খিদে পায় যে, মা, ওমা, মাগো!……

ওকে ভোলানো গেলনা এক কোয়া কাঁঠাল দিয়ে দু'দণ্ডের বেশি। ভুতুরি তোলা আছে সকালে সিদ্ধ করা হবে বলে, তাই ছাই হাতড়ে কোয়াটা মিলেছিল। আর নেই, আর একটি কোয়াও নেই।

এই যে ভাত নামবে যাদু খাবে। একটু সবুর, সোনা আমার। হল বলে, এই হল বলে।

শন্নু কেঁদে চলে। কথায় কি খিদে ভোলে কেউ।
আমায় খাবি? মানা খাবি? খা।

কোলে নিয়ে শুকনো মাই গুঁজে দিতে যায় শন্নুর মুখে, সে দাঁতে দাঁত কামড়ে থাকে। তিন বছর মাই ছেড়েছে দুধ না পেয়ে চার বছরের মানুষ, সে কি আর এ ফাঁকিতে ভোলে।

তখন উনানে চাপানো হাঁড়ি থেকে এক হাতা আধসিদ্ধ জাউ আর পাথরের বাটি থেকে একটু কচু শাক তাকে দেয় ফুলু। ঠাণ্ডা শাকটুকু

সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে শনু। খাওয়ার মতো জুড়োলেই খায় জাউটা। তারপর আরও চেয়ে কাঁদে, ঢিমে সুরে নেতিয়ে পড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইখানে।

সময় কি পার হয়ে গেছে, শনুর বাপের আসবার, এসেই যদি থাকে ওই গাড়িতে? এমনি যদি এসে থাকে, মিছিমিছি? এক কোশ পথ, জলে কাদায় চলার মতো নেই। হেঁটে আসতে সময় লাগবে বৈকি।

আসে যদি তো তাকে খাওয়াবে কি? পরশু বাড়ন্ত হবে চাল, কিনে না আনলে। এতগুলি মুখ তো বাড়িতে। বিকালে জাউ বরাদ্দ, নয় তো পচাটে গন্ধের নষ্ট যে চাল বুড়ো সরকারী দোকান থেকে এনেছে সস্তা দরে, ওই চালের ভাত। ভাগ্যে শনুর বাপের মনি অর্ডার এসে গিয়েছে ডাকঘর বন্ধ হবার আগে, চাল কেনা যাবে। কটা আর টাকা, কতটুকুই বা কেনা যাবে, যা দর বেড়েছে চালের। চাল বাড়ন্ত হবেই এ মাসে, ও আর ঠেকানো যাবে না, পরশুই হবে না চাল বাড়ন্ত এইটুকু শুধু ভরসা টাকাটা এসে পড়ায়। বুড়ো এগারো টাকা পেন্সন পেয়েছে, আগের জমানো দু'দশ টাকা আছেও নিশ্চয় হাতে, কিন্তু বুড়োর ভরসা করা বৃথা, ও নিজে খাবে, নাতিকে খাওয়াবে, নাতিকে ইংরেজী পড়াবে ইস্কুলে।

শীতকালের জমাট নারকেল তেলের মতো সাদা ঘি আনবে, পাঁপর আনবে লেবেঞ্চুস আনবে শনুর বাপ, শাড়ি আনবে, সায়া আনবে তার জন্য, এই জাউ আর কচু শাক সে খাওয়াবে নাকি

তাকে ? কুলোবে না—এতে তাদেরি আধপেটা হবে না পদীকে বাদ দিয়েও, ফুলুর বাপ এলে এতে কুলোবে না। চাট্টি চাল নিয়ে সে আবার ভাত রাঁধবে। দুটি যে ডাল আছে তোলা, তাও দিয়ে দেবে হাঁড়িতে। খিঁচুড়ি হবে না, ডালে চালে সেদ্ধ একটা জিনিস হবে যা হোক কিছু। ভিন্ন করে ডাল রাঁধতে হলে—

নিবু নিবু উনুনটার দিকে চেয়ে থাকে ফুলু। কাঠির মতো সরু কটা শুকনো ডাল আর বাকী আছে, পিসি যা কুড়িয়ে এনেছে সব ভিজে চুপসে, কালও জ্বলবে না। ডাল ভাতে একটা চড়াও সে রাঁধবে তবে কি দিয়ে শুনুর বাপ যদি এসেই পড়ে এখন ?

আসবেনা এখন আসতেই পারে না। ডাক ধর্মঘট শুরু হয়েছে, এখন কি আর সে ছুটি পাবে একটা দিনের, এমনি অবস্থায় দুমাসের মধ্যে পেল না, ধর্মঘট শুরু না হলে বরং কথা ছিল। এখন কাজ না করলে তো তাড়িয়েই দেবে একেবারে। বুড়ো তাই বলছিল।

কিন্তু যদি ধর্মঘট করে থাকে ফুলুর বাপ ?

নিশুতি রাতের ভিজে অন্ধকারকে ছিঁড়ে দেয় বিদ্বেষী কুকুরগুলির ভীরু আর্তনাদ। শেয়ালের পালা ডাকের জবাব নয় এটা, শেয়াল ডাকেনি কিছুক্ষণের মধ্যে। কি হল, কে এল পাড়ায়, কে জানে। ফুলুর চোখে ঘুম নেই। মাঝরাত্রি পর্যন্ত পেট ভরে অনেক কিছু খাওয়ার কল্পনার অলীক কষ্ট আর উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখে, চোখ

মেলে সে দেখবার চেষ্টা করে ঘরের আঁধার বেশী কম হল কি না। তাতেও আনমনা হতে পারে না।

মনাবাবু আসেনি বিকালের গাড়িতে। কানাই ছাড়া কেউ আসেনি। কানাই যে এসেছে তাও ফুলু টের পেয়েছে মাত্র খানিক আগে পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ কানাই-এর রামপ্রসাদী গান শুনে। এমন সুন্দর গাইতে পারে কানাই রামপ্রসাদী গান, মদ খেয়ে অনেক রাতে সে গান ধরলে এমন আকুল হয়ে ওঠে ফুলুর প্রাণটা। মন তুমি কৃষি কাজ জান না গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ কেন যে থেমে গেল কানাই।

কার সাথে যেন কথা বলছে। শুনুর বাপের গলা! বাবা শুনছেন ? ওঠেন। ছেলে এয়েছে আপনার। দোর খুলে দাও! খুলি।

আঁধার রাতে একা দোর খুলে দিতে ভয় করে শুনুর বাপকেও। সত্যি যদি না হয় এমন যদি হয় যে ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখছে, ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে দরজা খুলবে অজানার ডাকে, কোথায় চলে যাবে বাইরের রহস্যময় রাত্রির জগতে। পিসিকে ঠেলে তুলে দেয়। শুনুকে কাঁদায়। পচাকে ডাকে জোর গলায়। ঘুমের মোহকে করে নেয় বাস্তব। হুড়কো খোলার আগে শুধোয়, কে গা ?

আমি গো আমি। বীরেন।

বাইরে মেঘ ঢাকা চাঁদের আলোয় রাত্রির রং ফিকে, ঘরে গলা শুনে

মানুষ চিনতে হয়। ফুলু হাত ধরে বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে তক্তপোষে বসায়। মুখ না দেখে, মানুষ না দেখে, কুশল জানাজানি, কথা বলাবলি কেমন অর্থহীন শোনায়, ব্যাঙের মতো মনে হয়।

হঠাৎ যে এলি বীরু? বুড়ো বলে কাঁপা গলায়।

স্ট্রাইক হল যে? শোন নি?

সব্বোনাশ! বুড়োর গলায় কাঁপুনি নেই, আওয়াজটা দাপড়ানির, তুই করেছিস কি? অন্য সময় যেমন তেমন, এখন কামাই করলে তাড়িয়ে দেবে যে চাকরী থেকে!

সবাইকে তাড়াবে?

সবাইকে! সবাই কখনো ধম্মোঘট করে? তোর মত হাবা গোবা দু-চার জন গরম গরম কথা শুনে—

ঠিক আছ, ঠিক আছে। সব ডাকঘরে কুলুপ আঁটা। কাজ করব কোথা যে কামাই হবে? বীরেনের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা দেখাবার রেড়ির তেলের দীপটা জ্বালে ফুলু। তেলটুকু ফুরিয়ে যাবে; কাল মুস্কিল হবে সাঁঝকে বরণ করা। তা হোক প্রদীপের আলোয় হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি আম কাঠের সিন্দুক টিনের তোরঙ্গের ঘর সংসার আর মানুষগুলি রূপ নেয় সব জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাঙা চোরা জীর্ণ পুরানো দারিদ্রের রূপ।

বেড়ার ওপাশে পদী কাতরায়, দাদাগো, জ্বরে মরলাম গো।

একবারটি এলে না দাদা, দেখলেনা মোকে ?

খুব জ্বর ম্যালেরি ধরেছে। বলেছিলাম না তোমায় ? ফুলু বলে বীরেনকে। অ্যাঁ ? ও হ্যাঁ। বীরেন বলে আনমনে। শ্রান্ত ক্লান্ত নয়, তাকে চিন্তিত দেখায়, গম্ভীর।

পিসি বলে অনুযোগ দিয়ে, গেরন গেল, গঙ্গায় ডুব দেওয়ালি না বাবা আমাকে ?

পচা বলে, সবাই স্ট্রাইক করেছে মামা ? বাঃ কি মজা ! আমাদেরো স্কুলে কাল থেকে স্ট্রাইক।

কিসের স্ট্রাইক ? বীরেন জিজ্ঞাস করে। বুড়ো উৎকর্ণ হয়ে থাকে

মাইনে বাড়িয়েছে না, সেজন্য। আর দু'একজনকে তাড়িয়েছে বলে। শিবুদাকে চেনো তুমি, আরেকজনকে চেনো না, তার নাম সতীশ সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। মাইনে বাড়াবার জন্য মিটিং করেছিল ছেলেদের নিয়ে, সেক্রেটারীর নিন্দে করেছিল, তাই তাড়িয়েছে। ওদের না নিলে, মাইনে না কমালে আমরা আর যাচ্ছিনে স্কুলে।

ইস্কুলে যাবি না ? টান হয়ে যায় বুড়ো, রাগে থর থর করে কাঁপে

তোর ঘাড় যাবে ইস্কুল। আমি কাল তোকে ইস্কুল নিয়ে যাব। আট গণ্ডা মাইনে বেড়েছে তা তোর বাপের কি তুই গুনিস মাইনের টাকা ?

মুখ চোরা ভীরু ছেলেটাকে সোৎসাহে মামার সঙ্গে এত কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাহান্ন

পদী উঠে আসে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেড়ার ওপাশ থেকে। বীরেনের বিয়ের সময় ঘরের মাঝামাঝি মানুষের চেয়ে হাত খানেক উঁচু এই বেড়া উঠেছিল ছেলে বৌকে শুতে দেবার জন্য, এপাশের সব কথা ওপাশে শোনা যায়। শুধু কথা শুনে চলছিল না পদীর।

তিন্যাটুকু খেতে দেয়নি দাদা। 'কাঁদ কাঁদ' সুরে পদী নালীশ জানায়।

জ্বরের মধ্যে কি খাবি ? উঠে এলি কেন আবার ? যা, শুয়ে থাকবি যা।

সবাই ভড়কে যায় তাব ধমকে। জ্বর গায়ে বোনটা উঠে এসেছে একটু আদরের জন্য তাকে এমন করে ধমকানো ! ওর ন্যাকামিতে ফুলুরও গা জ্বলছিল, কিন্তু এভাবে ধমকে উঠাতে তারও মন সায় দেয় না। আনমনা গম্ভীর শুধু নয়, শুনুর বাপ যেন কেমন শক্ত আর নিষ্ঠুর হয়ে গেছে !

খারাপ লাগে সকলের, কিন্তু এমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধমক যে খায় সে খানিক হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে কথা কয় স্বাভাবিক ভাবে, অভিমানের লেশটুকুর হদিস মেলে না।

একটু উঠলে কি হয় শুয়েই তো আছি। হ্যাঁ দাদা, গুলি টুলি চলছে নাকি ? এখনো চলেনি।

কিছু খাবে নাকি তুমি ? ফুলু জিগগেস করে ভয়ে ভয়ে। কিছু নেই খেতে দেবার। শুনুর বাপ সত্যই বাড়ি এসেছে এ আনন্দে এতক্ষণ

বার বার ঝাপটা এসে লাগছিল এই লজ্জা ও দুঃখের যে, বাড়ির মানুষটা বাড়ি ফিরেছে এতকাল পরে তাকে খেতে দেবার কিছুই নেই গেরস্ত বাড়িতে।

বীরেন বলে সে এত রাতে কিছু খাবে না, গাড়িতে খেয়েছে। মনে শান্তি আসে না ফুলুর। সামনে যদি ধরে দিতে পারত কিছু তারপর শুনুর বাপ বলত খাবে না, তা হলে ছিল ভিন্ন কথা।

স্থান অদল বদল করে শোয়ার ব্যবস্থা হয়। বেড়ার একপাশে যায় সকলে, অন্য পাশে ফুলু, বীরেন আর শুনু। গাদাগাদি করে শুতে হয় সকলকে, কিন্ত উপায় কি, এতকাল পরে ছেলে বাড়ি এসেছে ছেলে বৌকে নিরিবিলি শুতে না দিলে চলবে কেন। নিবু নিবু দীপ-টা ফুলু হাতের বাতাসে নিবিয়ে দেয়। এবার কথা বলতে হবে চুপি চুপি, প্রায় কানে কানে নয় তো ও পাশে শুনতে পাবে ওরা।

বুক কাঁপছে শুনে থেকে। কেন করতে গেলে ধম্মোঘট?

হুঁ।

এখনো আনমনা অনিচ্ছুক মানুষটা, মোটে চাড় নেই, সাড়া নেই। এমন তো করে না কোনো বার বাড়ি এসে। আহত অভিমানে নিজেও চুপ করে থাকবে কিনা মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুয়ে ভাবে ফুলু। কিন্তু তা কি পারা যায়। টিপি টিপি শুরু হয়ে জোরে বৃষ্টি নেমে ঝমঝম আওয়াজ তোলে টিনের চালে। এমনি বৃষ্টি খানিকক্ষণ চললেই শোয়ার দফা শেষ। ভাঙা চালার তিন জায়গা

থেকে জল পড়বে ঘরের মধ্যে, উঠে সামলাতে হবে। তবে বৃষ্টির শব্দ ওঠায় একটু জোরেই এখন কথা বলা চলে, শোনা যাবে না।

কি হয়েছে তোমার ?

কি হয়েছে ? হয়নি কিছু। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম, ভাল লাগছে না এখন।

কাজ থাকবে না। তাড়িয়ে দেবে। উৎকণ্ঠায় ফুলু ব্যাকুল, তবে যে বললে তালা বন্ধ ডাকঘরে কিছু হবে না কাজে না গেলে।

সে কথা নয়। ভাবছি কি; চলে এলাম, কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে পাব না। বীরেনের কথা উৎকণ্ঠায় ভরা, তা ছাড়া; চলে এলাম, পিকেটিং-এর লোক যদি কম পড়ে ? যদি হেরে যাই আমরা ?

বললে না হাজার হাজার লোক ধর্মোঘট করেছে ? ওরা তো আছে।

তা আছে। কিন্তু—

কি বলবে ঠিক করতে পারছে না শুনুর বাপ। মনের ভাবটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না তাকে, এটা সে বুঝেছে যে হঠাৎ বাড়ি চলে এসে এখন ভারি উতলা হয়ে পড়েছে তার মন। এত বড় একটা কান্ড করে এসেছে, চাকরির ব্যাপার এ বাঁচন মরণের কথা। সেখানে কি হচ্ছে জানতে পারে না ভেবে আকুল তো হবেই মনটা। কিন্তু ও নেই বলে কিছু হবে না, ধর্মোঘট ভেস্তে যাবে, এ কোন দেশী কথা! এ দুশ্চিন্তায় মাথা-মুন্ডু মাথায় ঢোকে না ফুলুর। ওই কি কর্মকর্তা ছিল, ধর্মোঘট চালাচ্ছিল ? বীরেনের

বুকে মাথা রেখে সে তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। বোঝবার চেষ্টায় বীরেন বলে, কি জান, লড়াই চলছে তো একটা, একজন কম হলে জোর তো একটু কমল? তা ছাড়া, আমি চলে এলাম, আর দশজন আমার মতো ভাবল, একা একজন চলে গেলে কি হয়, সবাই তো আছে। বুঝলে না? ভাল লাগছে না আমার।

ভেবে আর কি করবে?

না আমার বিশ্রী লাগছে। মিটিং হবে আমি নেই, পিকেটিং হবে আমি নেই—

অবিরল জল ঝড়ে টিনের চালে, বিরাট জনতার গর্জনের মতো আওয়াজ চলে অবিরাম। কারো চোখে ঘুম নেই। বীরেন ছটফট করে জ্বরের রোগীর মতো। ফুলকে উঠে প্রদীপটা আবার জ্বালতে হয়, ঘরে জল পড়ছে। মেঝে ভেসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, মেঝেতে অর শোয়া চলবে না, আর কিছু রাখাও চলবে না। সেকেলে পুরনো তক্তপোষটি আর ও বছরের বানানো বাঁশের ছোট নিচু মাচাটিই এখন সম্বল সকলের। পদীকে মাচাটিতে শুতে দেওয়া হয়। কাঁথা কানি জিনিসপত্র নিয়ে অন্য সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে আশ্রয় নেয় তক্তপোষে।

ফুলু বসে মেঝেতে একটা পিঁড়ি পেতে। প্রদীপ নিভে গেছে তেল ফুরিয়ে। ভোরের আগে বীরেন বলে, আমি রওনা দি। ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে।

বিষ্টি পড়ছে যে ?

পড়ুক বিষ্টি। ভিজে ভিজেই যাব।

কাগজ মোড়া শুকনো জামা কাপড়ের পুঁটুলিটা বগল-দাবা করে ভিজতে ভিজতে বীরেন স্টেশানের দিকে এগিয়ে গেছে অর্ধেক পথ, পিছন থেকে ডাক আসে, মামা!

বীরেন দাঁড়ায় পচা এসে তার নাগাল ধরে। কেঁদে বলে, আমি কাল ইস্কুল যাব না মামা।

এই কথা বলতে এলি ভিজে ভিজে অ্যাদ্দুর ?

দাদু জোর করে নিয়ে যাবে ইস্কুলে। এখানে থাকব না আমি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

বীরেন হাঁটতে শুরু করে বলে, হাঁট তবে, জোরসে হাঁট। গাড়ি ফেল করলে চড় খাবি।

ওপরে বৃষ্টিপাত, নিচে খাল ছন্দ কাদা ভরা পিছল পথ। দু'জনে এগিয়ে চলে পাশাপাশি। বীরেন হাত ধরে পচার।

—০—

ভগবানের চেয়ে বড়ো

সোমনাথ লাহিড়ী

শব্দ ব্রহ্ম।

গভীর রাত্রে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে মাঝে মাঝে শান্টিং এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ হুইসিল বেজে উঠবে। থেকে থেকে জাহাজগুলো ভোঁ দেবে। নিঃশব্দ গম্ভীর যেন রেলওয়ে বাঁশি ছেলেমানুষিকে ভর্ৎসনা করছে।

অবিশ্যি এ শব্দগুলো তেমন কানে লাগে না, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না। ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসতে হয় তখন—যখন রাতের শেষ প্রহরে ঘোড়ায় টানা ধাঙড়ের গাড়িগুলো লোহার চাকার ওপর বিকট শব্দ করতে করতে ঠিক জানালার নীচে দিয়ে ছুটে চলে যায়।

বুকের ধরফড়ানি কমতে না কমতে ঢং ঢং ঝন্ ঝন্ ঘস্ ঘস্ শব্দ। যেন ঐক্যহীন ঐক্যতান। ট্রাম গাড়িগুলো বেড়িয়েছে। ভোরবেলায় তাড়াতাড়ি পেঁছানোর তাড়া নেই বলেই বোধ হয় তারা আরও রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে। শুধু মানুষ নয়, জীর্ণ বাড়িটা পর্যন্ত থরথর কম্পমান।

এবার শহর জাগল। ভোঁ বেজে চলল কল-কারখানায়। কাগজের হুকার, ফুটপাতের ফেরিওয়ালা, মোটর, ট্যাক্সি, লরি, রিকশা, ছ্যাকরা গাড়ি—ক্রমবর্ধমান শব্দের ব্রহ্মাণ্ড। নির্গুণ ব্রহ্মা সগুণ, সরব। লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মব্যস্ততার গুঞ্জন সম্মিলিত হয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল।

দুপুর বেলার দিকে হয়তো একটু ঝিমিয়ে পড়ত। মাটিওয়ালির মেয়েলি মিহি সুরে 'মাটি লিবে গো' তেমন খারাপ শোনাত না। কিন্তু সামনের কলেজটাই হল কাল। সারাদিন জুড়ে ছেলেদের আসা যাওয়া, জটলা, হল্লা হৈ-চৈ, কখনো কখনো ধস্তাধস্তি-মারামারি দুপুরটাকেও সরগরম রাখে।

তারপর আবার কাজ-ফেরতা জনতা আর যানবাহনের বৈকালিক গর্জন। খেলার মাঠ থেকে স্রোত ফিরে আসবে। দিবানিদ্রা শেষ করে সিনেমা-থিয়েটারগুলো জাগবে। মিটিংয়ের বক্তারা সরব হবেন সামনের পার্কে। দোকানে, রেস্তোরাঁয়, রাস্তায়, গলির মোড়ে মানুষের আওয়াজে আওয়াজে আর এক নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল। চলবে প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত।

* * * * * *

"ডাক্তার সাহেব, কোনো উপায়ই কি নেই", আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন অরুণবাবু। একমাত্র ছেলে, তায় মাতৃহীন। বাপ অরুণবাবুর

অন্তরের সমস্ত আবেগ ঐ একটি ছেলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সে আজ কঠিন রোগে মরণাপন্ন। রোগের বাড়াবাড়ি দেখে রাত দুটোর সময় বড় ডাক্তার ডেকে এনেছেন অরুণবাবু। কিন্তু ডাক্তার বিশেষ আশ্বাস দিতে পারেন নি। তাই এই কাতর প্রশ্ন।

"কি করব বলুন" ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলেন ডাক্তার সাহেব। "আশা একেবারে নেই তা বলিনে, তবে যা করতে হবে তা যে প্রায় অসম্ভব।"

"বলুন, বলুন, কি করতে হবে বলুন, "সাগ্রহে শুধালেন অরুণবাবু।" আমার যা কিছু আছে সব খরচ করব, যে চিকিৎসা বলবেন তারই ব্যবস্থা করব, আপনি শুধু ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার সাহেব।"

"কথাটা তো শুধু টাকার নয় মুশকিল হচ্ছে যে রোগীকে এখান থেকে সরানোর উপায় নেই, একটু নড়াচড়া করালেই Collapse করবে।

"বুঝতে পারলাম না কি বলছেন।"

"শুনুন,তা হলে খুলেই বলি। ওর রোগের crisis period আরম্ভ হয়েছে। কাল দুপুরের মধ্যে যা হোক হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। এই সময়টুকু যদি ওকে সমস্ত রকম shock থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তা হলে রোগী সেরে উঠবে। কিন্তু সেইটাই তো প্রায় অসম্ভব।"

"কেন? কেন?

" কারণ শব্দ। নড়াচড়ার শক্ও সহ্য করতে পারবে না, সুতরাং এখানেই রাখতে হবে। কিন্তু ভোর না হতেই তো আরম্ভ হবে শহরের নানা আওয়াজ। বন্ধ দরজা জানালা ভেদ করেও যতখানি ওর কানে পেঁছাবে, crisis-এর সময় ও তা সহ্য করতে পারবে না। সেইজন্যেই আশা দিতে পারছিনে।"

অন্তর মন্থন করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অরুণবাবুর। সব বুঝেও আবার যন্ত্রচালিতের মতো একই প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সাহেবকে :

"কোনো উপায়ই কি নেই ?

"সবই ভগবানের হাত," জবাব দিলেন ডাক্তার সাহেব Perfect Silence-এর মধ্যে যদি দুপুর পর্যন্ত রাখতে পারেন তা হলে ফাঁড়া কেটে যাবে ! নইলে hopeless। এখন আসি তবে, সকালের দিকে খবর দেবেন একবার।"

*　　　*　　　*

বাড়িটার কৌলিন্য ছিল। একেবারে বড়ো রাস্তার ওপর। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি সমস্তই ঘরের পাশে। তার ওপর সামনেই মস্ত বড়ো কলেজ আর স্কুল—ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সোরগোলে সরগরম। এমন রাস্তার ওপর বাড়ি ! বাড়ির ঠিকানা ১৩ নম্বর হ্যারিসন রোড। এ কথাটা অরুণবাবু যখনই কাউকে জানাতে পারতেন, তখনই মনের মধ্যে একটা আত্মপ্রসাদের সুর খেলে যেত।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঠিকানা ছাড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকালেই মনটা দমে যায়। মান্ধাতার আমলের জিরজিরে একতলা কোঠা—ঘর মাত্র দুখানা। রাস্তা দিয়ে ট্রাম বাস ছুটে গেলে সুস্থ মানুষেরও বুক কেঁপে ওঠে।

ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন যখন তখন নিশুতি রাত। ঘরের ভেতর আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি, কিন্তু বাইরে আর শব্দ নেই—সারা শহর

মৃত্যুর চেয়েও নিস্তব্ধ। তবুও অরুণবাবুর ভরসা হল না। উঠে গিয়ে সমস্ত দরজা জানালা এঁটে বন্ধ করে দিলেন। কাপড় গুঁজে দিলেন নালির মুখে। তারপর অভিশাপ দিতে লাগলেন বাড়িটাকে যে পজি-শনের কথা ভেবে সেদিন পর্যন্তও তাঁর মনে গর্বের সুর জেগে উঠত।

এমনি আর এক স্তব্ধ রাত্রে কান্না বেজেছিল ঐ বাড়িতে। কিন্তু সে কান্না অরুণবাবুর। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তাঁর স্ত্রী কাতর হন নি। রোগজীর্ণ হাত দুখানি ঘুমন্ত ছেলের মাথায় স্পর্শ করিয়ে বলেছিলেন: তুমি রইলে, ওর জন্যে আমার আর কোনো ভাবনা রইল না।

সে কথা মনে করে অরুণবাবুর চোখে জল এল। ধিক্কার দিলেন নিজেকে। পরলোকগতা সহধর্মিণীর শেষ আশাটুকু কি তাঁর অক্ষমতার ঘায়ে চুরমার হয়ে যাবে? ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন অরুণবাবু। একবার মনে হল—বিছানা, লেপ, তোশক যা কিছু ঘরে আছে সব বিছিয়ে দিয়ে আসেন রাস্তার ওপর যদি তাতে শহরের আসন্ন কোলাহল অন্ততঃ কিছু চাপা পড়ে। কিন্তু তাতে কি হবে, বিছানাপত্রে আর কতটুকু জায়গা ঢাকবে? তবে কি বালি ছড়িয়ে দেব? বস্তা বস্তা বালি দিয়ে ঢেকে দেব সমস্ত পথঘাট? কোথায় পাব অত বালি? কে ছড়াবে, কখন ছড়াবে?

বৃথা বৃথা, সমস্ত কল্পনাই বৃথা—ভাবলেন অরুণবাবু। শহর যখন জাগবে তখন সামান্য মানুষের সাধ্য কী যে এই জগন্নাথের যাত্রা রোধ করে? দুঃখ-অভিভূত মস্তিষ্কের মধ্যেও মনে পড়ে গেল কবির

প্রার্থনা—দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। কিন্তু কে শুনবে সে প্রার্থনা? ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন?

শরীর কিন্তু মনের সঙ্গে তাল দিতে পারে নি। ক্লান্ত, অবসন্ন চোখে কখন ঘুম নেমে এসেছিল। অরুণবাবুর ঘুম যখন ভাঙল তখন ঘড়িতে দশটা বাজে। ধড়মড়িয়ে উঠলেন অরুণবাবু। ছেলের দিকে চাইলেন, সে তখন অকাতরে ঘুমচ্ছে। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাইরে থেকে কোন শব্দ আসছে বলে মনে হল না। ছেলে বেশ শান্ত-ভাবে ঘুমিয়ে আছে দেখে ভরসা পেয়ে সন্তর্পণে ঘরের বাইরে এলেন অরুণবাবু। তারপর পথে নামলেন।

যা দেখলেন মনে হল তা বুঝি স্বপ্ন। অত বড় রাস্তা, কিন্তু গাড়ি চলছে না একখানাও। না ট্রাম, না মোটর, এমন-কি রিকশাও না। কলেজের সামনে ছেলেদের জটলা নেই, ফেরিওয়ালার হাঁকডাক নেই। বেলা দশটার সময় সারা রাস্তায় যেন গভীর রাত্রের স্তব্ধতা।

একটু এগিয়ে এলেন অরুণবাবু। রাস্তার লোক চলাচলও খুব সামান্য, ক্বচিৎ দু-একজন মানুষ দেখা যায়। এমনি একজনকে কাছে আসতে দেখে বিস্মিত অরুণবাবু প্রশ্ন করলেন:

" আচ্ছা, আজকে রাস্তাঘাট সব এরকম কেন বলতে পারেন? "

লোকটি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল:

" তা জানেন না? আজ যে হরতাল! "

—০—



উত্তরসূরী

অন্নপ্রাশন / অন্নগ্রাসন

শ্যামল জানা

কমলা রঙের শীতের ভোর তেমন উজ্জ্বল নয়। আসোলে কুয়াশায় মুড়িসুড়ি দিয়েছে কোলকাতা, ভোরেরা ম্রিয়মান। চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়েছি আমরাও—একশোয় মাত্র কুড়িজন। কোলকাতা / আমরা : কুয়াশা / চাদর। অনুপাতে একেবারে এক। যতক্ষণ কুয়াশা ততক্ষণ চাদর। ঠিক এ সময় হঠাৎ পরিচিত বাতাসেরা অনভ্যস্ত কানে চমকে উঠলো। চৌধুরী বাড়ীতে ঘণ্টাধ্বনি ?

পাড়ার যেকোনো বাড়ীর বিছানায় শুয়ে মাথার পেছনে জানালার শিক ভাগাভাগি করে দৃষ্টি চালালেই চোখে পড়ে চৌধুরী বাড়ীর ছাদ। ছাদের আলসেতে কাক, রুপোলী এ্যান্টেনা, বিদেশী চিনা-মাটির টবে নানান সাইজের নানা রকম ফুলের গাছ। এরা সবাই ঐ ছাদের রোজকার বাসিন্দা। আজ নতুন আর একজন জুটেছে। একটা

রঙীন নিশান। বর্ণ বৈচিত্র্যে অভিজাত। এতো রঙীন,—শিশুর মনও হার মেনে যাবে আশা করি। অভিজাতদের সবাই সমীহের চোখে দেখে। যেমন বাতাসেরা—পত্ পত্ করে উড়িয়েই চলেছে ঐ রঙীন নিশানটাকে।

ছাদের নীচেই মন্দির। চৌধুরীদের একান্তই নিজস্ব। ঘন্টাটা ওখানেই বাজছিলো। চাপা ঔদ্ধত্য নিয়ে, ছন্দ বজায় রেখে। দুটো ঘন্টাধ্বনির মাঝখানে শাঁকের আওয়াজও ভেসে আসছিলো। যারা বাজা-চ্ছিলো— স্পষ্টই বোঝা যায়, তারা শাঁখের ব্যাকরণ জানে না। অস্বা-ভাবিক নয়। যে বাঙালী ঠোঁটেরা অনর্গল বিদেশী কায়দায় ইংরেজী বলতে অভ্যস্ত; তাদের পরিচিতি বিদেশী লিপ্‌স্টিকের সঙ্গে থাকাটাই স্বাভাবিক। স্বদেশী শাঁখের সঙ্গে নয়।

আজ চৌধুরীবাবুর ছোট নাতির অন্নপ্রাশন। একেবারে সেকেলে প্রথায়, রীতিমত শাস্ত্রমতে। ধুলোপরা পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে। এখন মন্ত্রপাঠ চলছে। শেষ হলেই শুরু হবে-সোনার থালায় ষোল ব্যাঞ্জন প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্নপ্রাশন।

শিশুদের কান্নায় ভাষার প্রভেদ থাকেনা। থাকলে হয়তো চৌধুরী নাতি ইংরেজীতেই কেঁদে উঠতো। কাঁদারও অনেক কারণ আছে। যেমন—মাথার চেয়ে মুকুটের ওজন বেশী। একই কারণে দেহের চেয়ে গহনা। এছাড়া জন্মের পর থেকে সাফারীতে চোখ তৈরী ছিলো, এখন হঠাৎ ধুতি দেখেছে। তারপর যুবতীদের অহেতুক উচ্ছ্বাস, কাজ দেখানো লোকদের লোক শোনানো চেঁচামেচি, শিশু আর বালকের মধ্যবর্তী বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সচেতন বর-বউ খেলা, ক্যামেরার বিদ্যুৎ

চমৎকানি—এ সবই তাকে কাঁদিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফাঁকেই অন্নপ্রাশন হয়ে গেল।

জং ধরা শাস্ত্রের কোনো এক জায়গায় লেখা আছে—অন্নপ্রাশনের অন্নে মামা ছাড়া অন্য কারো অধিকার নেই। চৌধুরী নাতি এক্ষেত্রে ভাগ্যহীন। তার কোনো মামা নেই। তাই মুখে ভাতের দায়িত্ব—তাৎক্ষণিক, নিজস্ব সিদ্ধান্তে, নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তথাকথিত পুরোহিত। এর পরই বাঁধল মুশকিল। উচ্ছিষ্টান্নে ভাগ বসাতে গিয়ে, অজান্তেই নিজের অমঙ্গল আশংকায় কেঁদে উঠলেন ব্রাহ্মণ। আবার নিজের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের মলাটে পরিবেশন করলেন। এ উচ্ছিষ্টান্নে কারোরই অধিকার নেই।

সাবধানী পুরোহিত, উচ্ছিষ্টান্ন নতুন সরায় ঢেকে চলেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পরণে চৌধুরীদের দেওয়া আনকোরা নতুন শুভ্র পাট বস্ত্র। মুর্শিদাবাদ সিল্কের উজ্জ্বল গৈরিক নামাবলি। পৈতেটা দুধের মতো সাদা - সিনথেটিক হওয়াও অসম্ভব নয়। শুধু ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে টিকিটাই যা বাকি এবং চৌধুরী প্রদত্ত নয়। লনের শেষপ্রান্তে গেট থেকে একটু দূরে, পাঁচিলের কোণে, খানিক থমকে দাঁড়িয়ে পুরোহিত যখন বুঝলেন তার উপর কারো দৃষ্টি নেই, সাবধানে পুতে দিলেন ঐ উচ্ছিষ্টান্ন পূর্ণ সরাটা।

চৌধুরীদের গেট থেকে একটু দূরে যেখানে কাক আর কুকুরেরা মিটিং করে, দাঁড়িয়েছিলো ফুটপাত শিশুর মা, পেটের খরাকে সাময়িক বিরতি দেবার আশায়। বহুক্ষণ বাদে বুঝলো তার ভুল

হয়েছে। প্রথমেই বোঝা উচিত ছিলো — অন্নপ্রাশনের অন্ন দিনের দিন মেলে না, মেলে পরের দিন বাসি হলে — সর্ব্বোপরি যদি বাঁচে। ভুল হয়েছে ভেবে চলে যাচ্ছিলো বেচারী। থমকে দাঁড়াল সরা হাতে সন্ত্রস্ত পুরোহিতকে দেখে। প্রত্যক্ষ করলো সমস্ত ঘটনা। উপলব্ধি করলো। ফিরে গেল গোপনে আসার আশা নিয়ে আর একবার।

ফুটপাত - শিশুর মা ফিরে এলো ফুটপাত বাসস্থানে। ল্যাইট-পোস্টে চেরা দুফালি রোদ জাঁহাপনার মতো শুয়ে আছে তার শিশুর উলঙ্গ শরীরে। বাদামী রঙের শরীরটা ধুলোর পোষাকে খাকি হয়ে গেছে। তাই বলা যাচ্ছেনা—"আহা রোদে লাল হয়ে গেছে।" পাশেই শুয়ে আছে ওর বড়দি। ছেঁড়া পোশাকে যৌবন অবহেলিত। ওদিকে চোখই গেলনা মায়ের। তার ঘুমন্ত শিশুকে সযত্নে কোলে তুলে নিলো। অদ্ভুত মায়াময় এই কোলে তুলে নেওয়া। এতদিন ধরে তার কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে, এমন কি নিজের শিশুটিকে আদর করতে ও কোলে তুলে নেওয়াতেও যে একটা কর্কশ ভঙ্গী থাকতো—এই প্রথম তা যেন কোথায় উবে গেল। ছেলেকে, পাশেই, ফুটপাতের কিনারে, গঙ্গাকলে নিয়ে গেল। সঙ্গে নিলো বহুদিনের সযত্নে তুলে রাখা, একফালি চাঁদের মতো চ্যাপ্টা—'লাক্স'। জন্মের পর এই প্রথম সে চান করছে। তাও আবার সাবান দিয়ে। কুচি কুচি অস্থায়ী ফেনায় কান্না মিশে একাকার।

শাড়ীর আঁচল দিয়ে ছেলের গা মুছিয়ে স্ব-স্থানে ফিরে এলো

ফুটপাত-শিশুর মা। ছেলেকে কোলে নিয়েই বসে পড়লো। আর ঐ ময়লা চটে শোয়াতে ইচ্ছা করছেনা। খিদে পাচ্ছে যেন। মনে পড়ল সারাদিন খাওয়া হয়নি। ঝোলায় দুটো বাসি রুটি আছে—প্রাণকৃষ্ণ লেনের দিদি দিয়েছিলো। হাত বাড়ালো ঝোলায়—না থাক্। আজ তার উপোষ। বিয়াল্লিশ বছরের উপোষী শরীরটা এই প্রথম নিয়ম করে উপোষ করলো।

সেকেলে সূর্যটা ঘুম থেকে উঠে, চৌধুরীবাড়ীর সেকেলে কাজকর্ম দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আধুনিক চাঁদ এলো আকাশের বুকে। পশ্চিম পাড়ের শব্দ সঙ্গে নিয়ে রাত ঢুকলো চৌধুরী বাড়ীতে।

বিদেশী গালিচার লাল রঙটা এখানে অপমানিত। সারা হলঘর জুড়ে থেকে ও সবার বুটের পেষণ মুখ বুজে সহ্য করছে। যদিও অন্নপ্রাশন শিশুদেরই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি—তবু কোনো শিশুরই এখানে প্রবেশাধিকার নেই। স্টিরিও গম্ভীর স্বরে দেওয়ালের গোপন স্থান থেকে দুর্লভ পাশ্চাত্য অরকেস্ট্রা ভেসে আসছে। ভেসে আসছে অ র সবায়ের কান ছুঁয়ে, জানালা গলে মিশে যাচ্ছে বাতাসে। চারটে করে বেহেড পা (দুটো পেলব্, দুটো লোমশ) তাল মেলানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে। মদের ফোয়ারা উঠছে না ঠিকই, কিন্তু গবলেট চলকানি মদ গালিচাকে অপমান করতেও ছাড়ছেনা। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, যে বাড়ীর সকালটা সেকেলে উপকরণ অর্থাৎ—ঘন্টা, নিশান, শাঁখ, পাঁজি, শাস্ত্র, ধুতি শাড়ি, নামাবলি পৈতে, ইত্যাদিতে ঠাসা ছিলো; সেই বাড়ীরই রাতটা যেন মন্ত্রবলে ভোল্ পাল্টে—স্টিরিও, স্যাম্পেন, গব্লেট, ডিস্কো, মিনি-স্কার্ট, দুর্লভ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ঠাসা মানিয়ে গেছে।

চরম উশৃংখলতাকে সাক্ষী রেখে রাত এখন ভরা যুবতী। বোতলে সন্তুষ্ট দারোয়ান, আর কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারছেনা। টুলে বসে বসেই ঝিমোচ্ছে বেচারা। সকালের গোপন ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পেয়ে গেল ফুটপাত-শিশুর মা। দৃষ্টি আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে বিন্দুতে স্থির রেখে, ফুল ফোটার মতো ধীরে গেট পেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। কাঁখে স্তন্যমুখ ছেলে। জানালা গলে আসা স্নিগ্ধ অরকেস্ট্রা তার কান ছুঁয়ে গেল। ফালি চাঁদের আলোরা খালি চোখের মায়া বিস্তার করে জটিল আলোছায়া বিলোতে লাগলো সারা বাগানে। ফুটপাত শিশুর মা খুঁজতে লাগলো সেই জায়গাটা—যেখানে উপড়ানো ঘাসেরা আপাততঃ মমি হয়ে আছে ধর্ষিত মাটির স্তুপের পাশে। জায়গাটা পেল অবশেষে। আসোলে ইচ্ছের চাহিদাটাই বিশুদ্ধ ছিলো।

ঢিলে তালে অরকেস্ট্রা বাজছে। বেহেড পা-এরা এখন ঢিলে, অসংলগ্ন। বিদেশী কায়দায় বলা ইংরেজী ভাষাগুলো এখন জড়ানো, দুরবোধ্য। আর ওদিকে ক্ষিপ্র গতিতে মাটি খুঁড়ে চলেছে স্তন্যমুখ শিশুর মা—পশুনখ হাত দিয়ে। আগ্রহ আর কৌতুহল গর্তের দেওয়াল বেয়ে নিচে নামছে ক্রমশঃ। যত নামছে মাটির স্তুপ বাড়ছে হাতের গতি, আগ্রহ, কৌতুহল, মাটির স্তুপ; বাড়ছে ক্রমশঃ.........ক্রমশঃ। অবশেষে সরায় গিয়ে সব স্থির। হাত, পা, কৌতুহল, আগ্রহ, মাটির স্তুপ-সবই ভেনাসের উলঙ্গ মূর্তির মতো স্থির। কতক্ষণ জানিনা—আবার হঠাৎই মুহূর্তের নোটিশে ছিঁড়ে যায় অপরূপ মাইম্। ওদের স্টিরিও, স্যাম্পেন, গব্লেট, ডিস্কো, মিনিস্কার্ট, দুর্লভ পশ্চিম সঙ্গীতে সব কিছু এক হাতের মুঠোয় পুরে, সমস্ত উল্লাস মুখে মেখে শিল্পীর ইজেলে লগ্ন

ফুটপাত শিশুর মা। অপর হাতে কাঙ্খিত বস্তুটি—অন্নপূর্ণ মাটির সরা।

আর একটা শিশুর মুখ এ'টো হয়ে গেলো। একই পুরোহিতের মুখ নিসৃত মন্ত্রপাঠ মাখা একই অন্নে। মুখ এ'টো হয়ে গেল এর–ওর। চৌধুরী শিশুর-ভিখারী শিশুর।

তবে দিনে নয় রাতে। সবার সাক্ষাতে, আনন্দে হিল্লোলে, ঘটা করে নয়—সবার অজান্তে, ভয়ের সাতর্পণে, মাঝরাতে, চুরি করে। ওর অন্নপ্রাশন—এর অন্নগ্রাসন।

—০—

মোরগ

সরোজ দাস

লোধাগুলি গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে কিনী মাহাতোর মাটির ঘর। ঘর না বলে বোধ বোধ হয় ডেরা কিংবা ঝুপড়ি বলাই উচিত। জঙ্গল থেকে সন্তর্পণে চুরি করে কেটে আনা কাঁচ শালগাছের খুঁটিসার ঘর। ডাল-পালার বেড়া: ভেতরের কিছুটা অংশে মাটির প্রলেপ। চালে তালপাতার ছাউনি; কোথাও আবার খড়ের জোড়াতালি!

জায়গাটা কিনীর নিজের নয়। অবশ্য তার দোষ কি? তার মত অন্য অনেক জনাই তো খাস-জঙ্গলের পতিত জায়গা জবর দখল করে বসত করেছে! পরের দেখেই না তবে কিনী ছাউনি ফেলেছে এক চিলতে সরু জায়গায়। বন বিভাগের কর্মচারী এসব দেখেও না দেখার ভান করেছে কলাটা মুলোটা আদায় করে। আদের উৎখাত করবার জন্য লাঠি উঁচিয়ে কেউ তেড়ে আসেনি। তাই সবাই ভেবেছে কোন একদিন এ জায়গা জবর দখলকারীদের অর্থাৎ তাদের নিজস্ব হবে।

কাল্লী মাহাতো শক্ত সমর্থ মানুষ ছিল। কাউকে সে ডরাত না। সবাই তাকে সমীহ করত, মানত। কাজ কামও করত; বউবেটিকে ভালবাসত। হঠাৎ একবার ব্যারাম ধরল। বিমারীতে তিন দিনের দিন সে খতম হল! ডাক্তার ডাকল না, পেটে ওষুধ পড়ল না, চিকিচ্ছে হল না। ব্যস্। সেই থেকেই কিনী মেয়ে মালতীকে নিয়ে এখানে রয়েছে। দিন গুজরানের জন্যে তাদের কাজের কত রকমের ধান্দাই না করতে হচ্ছে। মালতী বড় হচ্ছে। চড় চড় করে বাড়ছে। মেয়ে মানুষের বাড় কলা গাছের ঝাড়। পেটপুরে খেতে না পেয়েও মেয়েরা যে কিভাবে এমন আচমকা বেড়ে ওঠে কিনীর তা ঠাহর হয় না। মেয়ের জন্যে কিনীর ভাবনা হয়, ভয় হয়।

মালতী কিছুদিন মাইতিবাবুর বাড়ীতে কাজ করত, গরু চরাত মাঠে। কিন্তু ডাকাবুকো ড্যাকরা ছেলে ছোকরার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মালতী সে কাজ ছেড়ে দিল। আসলে মা-ই মেয়ে অকালে বেহাত হয়ে যাবার ভয়ে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে নিল।

কিনীর ঘরে একপাল মুরগী। ঘরের মধ্যেই বাঁশ ঘিরে তাদের থাকার ঘর বানিয়েছে। প্রথম প্রথম দাওয়ায় রাখত। কিন্তু যা জানোয়ারের উৎপাত! শেয়ালে কি খট্টাশে মাঝে মাঝেই মুরগীর খোপ থেকে রাত্রে মুরগী ধরে নিয়ে যেত।

কিনী গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে ডিম বেচে। ডিমের উপরে মুরগী বসিয়ে তা' দিয়ে ছানা তোলে। ছানাগুলো বড় হলে সেগুলো ঝুড়িতে ভরে মুখে জাল ঘিরে বিক্রী করে বাবুদের কাছে।

মালতীর মনে বড় মায়া। নিজের হাতে পালন করা আর বড় করে তোলা মুরগী বেচতে দিতে সে চায় না। কিন্তু উপায় কি? কিনী বোঝায়, বাবুরা হাঁসের ডিম কিনতে চায় না। হাঁসের ডিম খেলে নাকি বাত হয়। ওদের বউরা, মেয়েরা যাদের গায়ের রং মুরগীর পাতলা খোসার ডিমের মত লাল তারা মুরগীর ডিম হাফ বল্ করে খায়। পোয়াতী বউরা আর বাবুরা যাদের নানান রোগ আর পেসার কচি মুরগীর মাংস যাকে বলে চেকেন খেলে ভাল থাকে। ওরা না কিনলে কোথায় বেচতুম বল? আমাদের ভুখা মরতে হত!

দেশী মুরগী প্রতিদিন ডিম পাড়ে না। মাঝে মাঝে জিরোয়। কিনীর ডিম দেবার মত ডাগর মুরগীর সংখ্যা বেশী নয়। মাত্র একটি দুটি ডিম নিয়ে দূরে যাওয়া চলে না। সর্বদিন কিনী তাই দূর গাঁয়ে যায় না।

কিনীর কাজের অন্ত নেই। কয়লা কেনার সামর্থ্যও তার নেই। কাছাকাছি বনজঙ্গল থেকে কখনও সে শুখনো শালপাতা কুড়িয়ে আনে, কখনো শুকা মরা ডালপালা ভেঙ্গে নিয়ে আসে জ্বালানীর জন্য। গ্রামে বড়লোক বাবুদের বাড়ীতে নানান রকমের কাজ করে। বিনিময়ে চাল, মুড়ি কিছু পায়। অনিয়মিত আয়ে মা ও মেয়ে কোনমতে কায়ক্লেশে এক বেলা এক সন্ধ্যা আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়।

মালতী ঘরের খুঁটিনাটি কাজ করে। ভোর হলেই মুরগী ছেড়ে দেয়, বেলা হলেই যেসব মুরগীর ডিম দেবার কথা সেগুলোকে ডেকে ডেকে খোপের মধ্যে পুরে দেয়। এক একটা মুরগী আছে যারা বাঁধা

ঘরের চেয়ে বনে জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে বসে ডিম দিতে ভালবাসে। বাচ্চা মুরগীদের মালতীই খেতে দেয়। কাক-চিল ও কুকুরের হাত থেকে রক্ষা করে। রান্নার দায়িত্ব সে-ই পালন করে। গভীর কুয়ো থেকে মাটির কলস ভরে খাবার জলও সে আনে।

সেদিন সন্ধ্যায় ভিন গেরাম থেকে ফিরে এসে কিনী শুনল যে বড় লাল মোরগটা বেপাত্তা! মালতী অনেক খুঁজেছে, অনেক ডেকেছে কিন্তু পায়নি। একথা শুনে কিনী প্রথমে ভীষণ রেগে উঠল। মেয়েকে বকল, তারপর কাঁদল। স্বামী হারানোর পুরনো শোক যেন উথলে উঠল।

মুরগীর স্যাথে মোরগ থাকা দরকার নৈলে ঠিকমত ডিম দেয় না; মুরগীরা আনন্দে থাকে না। যেমন মেয়েছেলের সঙ্গে পুরুষ মানুষ।

ঐ মোরগটার হাভভাব যাত্রাদলের মহারাজের মত। সবসময়ে সে মাথা উঁচু করে চলে। জোরে ডাকে। চলা ফেরায় সে খরগতি। তার দস্যিপনায় অন্য মুরগীরা অতিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সঙ্গে তার ছিল এখন ভাব, পরক্ষণেই আড়ি। এই মিল, এই গরমিল আর মারামারি। সে ছিল পালের সর্দার। তার জন্য শুধু মুরগীর দল নয়, কিনী মালতীও নির্ভয় ছিল। কুকুর, শিয়াল, সাপ ও শত্রু দেখলেই মুহূর্তে উড়ে গিয়ে উঁচু গাছের ডালে বসে গলা ফুলিয়ে কোঁকর কোঁক ডাক ছাড়ত। যেন বলত, শয়তান আসছে তফাৎ যাও!

মোরগটার ওপরে অনেকের লোভ ছিল। তারা বেশী দামে কিনতে চেয়েছিল। পুষতে নয় মাংস খাবার জন্যে। কিনী দেয়নি। এখন সে ভাবল, বেচলে এই ক্ষতির হাত থেকে সে নিস্তার পেত!

কয়েক দিন আগে কিনী কাঠ ভাঙতে গিয়ে দেখেছে জঙ্গলে লোধাদের ছাউনি পড়েছে। ওরা কোথাও বেশীদিন থাকে না। ওরা বেদে, স্বভাবে চঞ্চল। যেন পদ্মপাতার জল। শোনা যায়, চুরি ওদের প্রিয় পেশা। কিনী ভাবল, ওদের কেউ কি মোরগটা চুরি করে ধরে নিয়ে গেছে? কিন্তু ওরা হিংস্র। একলা ওদের ডেরায় যেতে কিনীর সাহসে কুলোল না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি?

সতু ঘোষের বাড়ীর কাছে যেতে কিনী চৌধুরীর আম বাগানে কাদের কথাবার্ত্তা ও চলাফেরা শুনল। একটা আলোর শিখাও সে দেখতে পেল। সে এগিয়ে গেল চুপি চুপি!

সতু ঘোষ আগে কোন একটা আপিসে চাকরী করত। সবাই বলে ঘোষবাবু নয় ঘুষবাবু। ঘুষের নাকি অঢেল টাকা। কিনী অত শত জানে না, বোঝে না। তবে সে দেখেছে রাতারাতি সতু বড়লোক হয়েছে, জমি কিনেছে, বাড়ী করেছে। এখন নাকি সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে পি, ডবলু, ডি-র মস্ত কনট্রেকটার হয়েছে। ঝাড়গ্রাম টাউনে নতুন বাড়ী করে উঠে গেছে। গাঁয়ের এই বাড়ী ও বাগান বেওয়ারিশ পড়ে রয়েছে। অবশ্য সতুবাবুর বড় ছেলে কেষ্ট নাকি নাম, গ্রামে থাকতে পছন্দ করে। সে মাঝে মাঝে গ্রামে আসে। পয়সা ছড়ায়। ইয়ার বন্ধু নিয়ে হৈ হৈ করে। তারপর আবার শহরে মা বাবার কাছে ফিরে গিয়ে লেখাপড়া করে। ছেলেটার স্বভাব চরিত্তির লোকে বলে ভাল নয়। গাঁয়ের বেড়ে ওঠা বিয়ে না-হওয়া মেয়েরা কেষ্টর সামনে সহজে বেরোয় না। সতু-বাবুর বাড়ীর চাকর ভুতো শবরের সঙ্গে কেষ্টর সাঠ আছে।

কিনী বাগানে ঢুকল। সে পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে দেখল কেষ্ট সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লম্বা ধারাল ছুরি নিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে। সে বলছে ভুতো এবার ওটা খালপোস করে ফেল্। কয়েকটা কলাপাতা কেটে আন্। ওটাকে আমি ততক্ষণ ধরি।

ভুতো মোরগটা কেষ্টর কাছে দিল। মোরগটা ঝটপট করছে। তার ঘাড়গলা এমন ভাবে শক্ত হাতে ধরা রয়েছে যে সে চেঁচাতে পারছে না, উড়তে পারছে না।

আশায় আনন্দে, ভয়ে উদ্বেগে কিনীর বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। ঐতো তার মোরগ! সে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে মোরগটা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বুকের ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে পড়ি মরি করে চোঁ দৌড় দিল। কেষ্ট ও ভুতো পরিস্থিতির আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে রইল।

কিনী রাগে উন্মত্ত হয়ে প্রথমে পঞ্চায়েতের শরণাপন্ন হল। এর বিহিত চাই।

পঞ্চায়েতের বাবুরা যারা সতুবাবু বলতে অজ্ঞান তারা বলল, এবার ছাড়ান দে কিনী। ছেলেমানুষ ভুল করেছে।

নিরপেক্ষরা বলল, তুই থানায় যা কিনী। বড়লোকের সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে আমরা বিরোধ বাধাতে পারব না।

কিনী গর্জে উঠল, পারবে না কেন? তোমরা গাঁয়ের মানুষ নয়, পাঁচজনের মাথা নয়? ভোট নিছ না? গরীব দুঃখীকে দেখবে না কেন? সতুবাবু তোমাদের চাঁদা দেয় বলে তোমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না?

বিরক্ত হয়ে বাবুরা বললেন, বললাম ত পারব না। থানায় যা। তোর মন চায় যা তাই কর্।

পরদিন সকালে রাগে টগবগ করতে করতে কিনী থানায় গেল মোরগসহ। তার অভিযোগ দারোগাবাবু লিখে নিলেন কাগজে। সীজার লিস্ট লিখে মোরগ সীজ করলেন। কয়েকটা কাগজে কিনীর টিপছাপ নিলেন। তারপর কিনীকে বললেন, এখন বাড়ী যাও। একদিন তদন্ত করতে যাব।

—আমার মোরগটা?—ওটা থাকবে। কেসে দরকার লাগবে। —ওটাকে খেতে দিবেন তো? —নিশ্চয়ই। ওটাই চুরির আসল প্রমাণ। যাও নির্ভয়ে বাড়ী যাও।

কয়েকজন মাতব্বর মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলো। মীমাংসা করতে চাইল। কিনী অন্যের পরামর্শে রাজী হল না। সে বলল, থানাদার কি করে, কি বলে দেখি।

কেষ্ট ও ভুতো কোর্টে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিল।

কয়েক মাস বাদে কোর্টে কেস উঠল। কিনী সাক্ষীর সমন পেয়ে হাজির হল কয়েকজন পড়শীর সঙ্গে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, মাত্র একটা মোরগ নিয়ে এই মামলা। মিটিয়ে নিলে কি মঙ্গল হয় না?

এ্যাসিস্‌ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, বলেছিলাম স্যার ফরিয়াদী রাজী হয়নি।

ম্যাজিস্ট্রেট কিনীকে বললেন, দেখ বুড়িমা ওরা অল্পবয়সী ছেলে

ঝোঁকের মথায় ভুল করেছে। এ মোকদ্দমা মীমাংসা করে নাও। গাঁয়ে থাকতে হলে মিলেমিশে থাকতে হয়। পরের সুখদুঃখ দেখতে হয়। ওরা তোমার ছেলের মত। ওদের এবারকার মত মাপ করে দাও। আর কখনও তোমার ক্ষতি করবে না। তাছাড়া তোমার মোরগ তো শেষ পর্যন্ত ওরা মেরে খেতে পারে নি।

কিনী বলল, হুজুর আমার মা-বাপ। আমি গরীব। খেতে পাই না, পরতে পাই না। তবু ভিক্ষে করি না। ওরা বড়লোক; কিন্তু ওদের দোরে যাই না। একটা মাত্র মোরগের জন্যে এ মামলা আমি করিনি। কথায় বলে চোরের দশদিন, সাধুর একদিন। আগে অজান্তে আমার অনেক মুরগী চুরি গেছে। হাতে নাতে এবার ধরেছি। তাই মামলা করেছি। আগে ভাবতুম শেয়ালে খটাসে আমার মুরগী মেরেছে তা নয় হুজুর ওরা মেরে খেয়েছে। কাঙালের ধন নিয়ে ফুর্তি করেছে। ওরা মানুষ শেয়াল।

ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বুড়িমা যা বলছে তা কি সত্যি?

ভুতো কেষ্টর দিকে তাকাল। কেষ্ট সপ্রতিভ ভাবে বলল, না স্যার।

কিনী ঝাঁঝিয়ে উঠল, থুক থুক মিথ্যুক! হুজুর, ওই কেষ্টই হল দুষ্টের শিরোমণি। ভুতো ওর চ্যালা। দুজনেই শনি।

কেষ্ট ধমক দিল, বাজে কথা বোলো না বুড়ী।

বুড়ী আরও রেগে উঠল। বলল, হুজুর ও বড়লোক বাপের ছেলে। ওরা এই ঝাড়গ্রাম টাউনে থাকে। ও মাঝে মাঝে গাঁয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফিস্টি করে, ফষ্টিনষ্টি করে। ছোটলোকদের বাড়ীতে

গিয়ে মদ গেলে। মাতলামো করে।

কেষ্ট বিব্রত বোধ করল। প্রতিবাদের সুরে সে বলল, সমস্ত কথাই মিথ্যা স্যার।

আবার কিনী বলল, পরম ঘৃণাভরে, থুক থুক মিথ্যুক! বুকে হাত দিয়ে হলফ নিয়ে বল্ গরীবের ঘরের মেয়েদের পিছনে তুই ঘুর্ ঘুর্ করিস না? মোরগের মত তাদের দেখে চক্কর মারিস না? হুজুর আপনি বলুন গরীব বলে আমরা মানুষ নই? গরীবের মেয়েরা কি মুরগী আর বড়লোকের আদুরে ছেলে বলে ও কি মোরগ? তবে ও কেন তাদের জ্বালাতন করে, কেন তাদের সুযোগ পেলে তা' দিতে চায়। ওর ঘরে কি মা-বোন নেই?

কিনীর চোখে বুঝি জল এলো। আবেগে তার গলা বুজে এলো।

ম্যাজিস্ট্রেট কেষ্টকে উপদেশ দিলেন। শাসনও করলেন। বললেন, তুমি ইয়ংম্যান। কলেজে পড়ছ। চরিত্র নষ্ট করো না। ভাল হও। সৎপথে মানুষ হও। সংযত হও। বাবার বংশের আর দেশের মুখ উজ্বল কর। গরীবের দুঃখকষ্ট উপলব্ধি কর। তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ শুনলাম তা বড়ই লজ্জার ও কলংকের। তুমি অন্যায় করেছ। বুড়ীমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। সবার সামনে এখানে এখন প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি যা করেছ—তার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। তুমি সৎ ও ভদ্র হবে।

সতুবাবু কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছেলেকে বললেন রাগতঃ স্বরে, হাকিম যা বলছেন, তাই কর।

কিনী ম্যাজিস্ট্রেটের কথায় মুগ্ধ হল। মামলা মিটিয়ে ফেলল। বলল, ও ভাল হবে বলেছে, মাপ চেয়েছে—তাই সই।

ম্যাজিস্ট্রেট খুশী হয়ে বললেন, উভয় পক্ষ সুখে শান্তিতে আত্মীয়র মত বসবাস করবে এই সর্ত্তে এই কেস নিষ্পত্তি করলাম।

কিনী জানতে চাইল, হুজুর এবার আমার মোরগ ফিরে পাব তো?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, নিশ্চয়ই পাবে। মিঃ এ, পি, পি, আপনি ওকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন!

এ, পি, পি বললেন, হ্যাঁ স্যার।

এ, পি, পি, কিনীকে নিয়ে কোর্টঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটা কাগজে কিছু লিখে কিনীকে দিয়ে বললেন, থানায় যাও। তোমার মোরগ তুমি ফিরে পাবে।

ঘন্টাখানেক বাদে এ, পি, পিকে কিনীর সঙ্গে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন, আবার কি হয়েছে? ফিরে এলে কেন?

কিনী বলল, হুজুর আমার মোরগ!

কেন ফেরৎ পাওনি?

না বাপ। থানাদাররা বলল, সেটা নাকি কবে মরে গেছে। কিন্তু আমার মন বলছে ওটা ওরা জবাই করে খেয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে কিনী মেঝেতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এ, পি, পি বললেন, স্যার থানা একটা জামিননামা পাঠিয়ে লিখেছে যে ওটা সীজ করেই বণ্ডে তার মালিক অর্থাৎ এই কিনীকে ফেরৎ দিয়েছে সেই দিনেই।

এ, পি, পির মুখে অদ্ভুত হাসির ঝিলিক। ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলেন, হোয়াইট ডু ইউ মীন ?

স্যার, সীজ করা সত্য। বন্ড নেওয়াও সত্য। তবে মনে হচ্ছে এই বুড়ীমায়ের কথাও সত্যি স্যার।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, বুঝেছি। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু কি করা যায় না।

হতাশভাবে এ, পি, পি বললেন এখন আর কিছুই করার নেই স্যার। কেন না কিনীর টিপ রয়েছে জিম্মানামায়।

অবশেষে কিনী মোরগের শোকে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এ. পি, পির সঙ্গে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল। উঁচু চেয়ারে বিচারক পাথরের মূর্তির মত স্থির স্থবির হয়ে বসে রইলেন অক্ষম আক্রোশে আর সুগভীর বেদনায়।

—০—

পেয়ার আলির গলা জল

কল্যাণ দে

সয়ে সয়ে খাওয়ার জন্য অল্প জলে জিইয়ে রাখা জিয়ল মাছের মতো পেয়ার আলির বুকের ভিতরটা ছলবলিয়ে ওঠে। এ চরের বুকে পায়ের পাতা পড়লে আলি সাহেবের বুকের ভিতরে কত দুঃস্বপ্নের দিনেও এই অনুভূতির ব্যতিক্রম হয়নি।

পেয়ার আলি একটা লাফ দিয়ে পাড়ে নেমে এলো। দেড় মণি ওজনটা হাল্কা করে জেলী বউয়ের নাকছাবির মতো জলে বার কয়েক দুলে উঠলো। নৌকার ভিতর জমে ওঠা জল ছেঁকে ফেলতে ফেলতে নৌকার মাঝি পরেশ সুধালো, মিয়া সাহেব নৌকা ঘাটে রাখুম ?

পেয়ার আলি টিল খাওয়া রঙীন লুঙ্গিতে গিট কষে বললো, আইজ আর ফিরুম না কাইল সকালে নাও লাগাইস।

পরেশ মুখে কিছু বললো না, মুচকি হাসলো, মনে মনে বললো "শালা নাগর" পেয়ার আলি নদীর নীচু পাড় থেকে ধীরে সুস্থে উপরে

উঠে এলো। পরেশ একটা বিড়ি ধরিয়ে নৌকার মুখ দিল ঘুরিয়ে। নদীর বুক থেকে একটা গান ভেসে এলো, ও গুনের নাইয়ারে⋯।

তিস্তার পাড় ঘেষে এই বোয়াল-মারির চর। অনেক আগে তিস্তার গতি ছিল এই পথে, সময়ের স্রোতে স্রোতে ত্রিস্রোতা তার গতিপথ পরিবর্তন করে সরে গেল দূরে। উর্বর চর উঠলো জেগে। বোয়াল-মারি নাম হলো কেন এই চরের তারও একটা নাতিদীর্ঘ ইতিহাস আছে, যেমন থাকে আর পাঁচটা নামের অতীতে।

প্রশ্ন উঠলো এই জেগে উঠা উর্বর জমির মালিকানা কার ?

এলাকার জোতদার নকিবুদ্দিন বললো কার আবার ? আমার। তিস্তা বুড়ি কি আমার কম নিয়েছে ? তার বিনিময়ে এতো মুষ্ঠি ভিক্ষা।

আর যারা ছোট মাঝারি তরফের ছিল তারা দাঁত বসাবার সাহস পেল না, কারণ নকিবুদ্দিনের হাতে নিয়মিত রেয়াজ করা কয়েক গণ্ডা লাঠিয়াল ছিল। ছোট তরফের যারা ছিল তারা ফিসফিসিয়ে চালু করলো, "তিস্তা বুড়ি দিল বর, বোয়ালের পেটে গেল চর"।

পেয়ার আলি সম্পর্কে নকিবুদ্দিনের পেয়ারের শ্যালক। নকিবুদ্দিনের বড়, মেঝ দুই বিয়াই যখন বংশের খানদান রাখতে ব্যর্থ হলো, তখনি পেয়ার আলির বোন জহিদার কোলে নেমে এলো আল্লার পরম দোয়া, বার্ধক্যের গা ঘেঁষে নকিবুদ্দিন পুত্রের পিতা হলো। ইসলামপুরের মেলা থেকে উট এলো, উটের সাথে গোটা কয় গরুও কোরবান হলো। আশে পাশের গাঁয়ের গরীব মানুষ বাড়ীর সামনে

মেলা বসিয়ে খেল, নকিবুদ্দিন নগদ পয়সা ও কাপড় বিলালো গরীব দুঃখীদের মধ্যে।

পেয়ার আলি তখন ঢাকায়, সবে যৌবনে পড়েছে কি পড়েনি, ঢাকায় ছোট ব্যবসা খুলেছে, ঝুনো নারকোলের সাথে কখনো গুড়, কখনো মরিচ, সবাই চোখ টাটিয়ে বললে এই বয়সে এই, বড় হলে ইস্পাহানি কিংবা আগা খাঁ হবে, পেয়ার আলি সেই বয়সেই বুঝলো কারবারের উপর জিনের কুনজর পড়েছে।

কারবার গুটিয়ে এনে জলপাইগুড়িতে উঠে এলো পেয়ার আলি। এখানে এসেও ব্যবসাটা চলছিল ভালো কিন্তু স্যাকরার ঠুক ঠাকে বাঁধ সাধলো কামারের এক ঘা। দেশ গেল দুভাগ হয়ে। পেয়ার আলি সেই যে এলো খোয়াল-মারির চরে আর ফিরলো না।

এর ক বছর পরেই নকিবুদ্দিন পুত্রের অস্ফুট আব্বাজান ডাক শুনে পিতৃহৃদয়কে কৃতার্থ করে এক সন্ধ্যায় সশরীরে বেহেস্তে গেল চলে।

পেয়ার আলি ঝুনো নারকেল পাটাগুড় মরিচের ব্যবসাটা বুঝতো ভালো কিন্তু জমি জিরাতের রহস্য রসিকতা বুঝবার মতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তখনো তার বাকি ছিল অনেক। মাঝারি তরফের যারা ছিল তারা অনভিজ্ঞ পেয়ার আলির সঙ্গে সুরু করলো পেয়ার মাখানো মসকরা। হাসির দমকে পেয়ার সাহেবের পেট ফাটে আর কি। হাসি থামিয়ে দম নিয়ে যখন পেয়ার আলি অভিজ্ঞ রসিকের মতো চোখ মেললো তখন তিস্তা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, শ দেড়েক কি দুশো বিঘা হাতের বাইরে চলে গেছে, ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই।

কামারের এক ঘায়ে শুধু দেশ ভাগই হলো না, ভাগ হয়ে গেল জীবন জীবিকার প্রশ্ন। যাদের অঢেল ছিল তারা কেউ রইলো, কেউ সব

বেঁচে যুবতী মেয়েকে গর্ভবতী বউ সাজিয়ে পেরিয়ে এলো সান্তাহার, পেটরাপোল, হলদীবাড়ী, হিলি। আর যাদের কিছু ছিল না তাদের কেউ কপালে করাঘাত করে মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল পূর্ব পুরুষের ভিটায় প্রদীপ দিতে, সন্ধ্যায় আজান গাইতে। আর অনেকেই ছেঁড়া শীতলপাটি নারকেল-নাড়ু তৈরীর কাঠ কিংবা পাথরের তৈরী সাজ, ঠানদি কিংবা খুড়ী শ্বাশুরীর নিজ হাতে তৈরী ফুল তোলা নক্‌সা কাটা ছেঁড়া কাঁথা, কর্ণ-ফুলির তীরে বসা সূর্যখোলার মেলায় কেনা শনি চন্ডী পাঁচালী, পান্তা খাবার পাড় উঁচু সান্‌কী, আর পীরদরগায় শিন্নি দেবার কমদামী মালসা নিয়ে এগিয়ে এলো অনিশ্চতের বুক খুঁড়ে ভবিষ্যতের পাথেয় খুঁজতে। ছিন্নমূল এলো দলে দলে সারে সারে, শ্রেণী হিসাবে ধর্ম, বর্ণ হিসাবে কাঁখে ন্যাংটা হাড্ডিসার উপোসী ছেলে, মাথায় ওজনসার টোপলা, শুকনো জ্বল জ্বলে চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ এলো কাতারে কাতারে। ভিটে মাটি ফেলে আসার সময় যাকে সঙ্গে নেবার কথা কারো মনে ছিল না, সেই সংস্কার কুসংস্কার ব্যাধি এলো মানুষগুলোর অজান্তে মানুষ-গুলোকে ভর করে। ইত্যবসরে আজাদীও এলো বোরখা ঢাকা পরীর মতো সলজ্জ যুবতীর ভীরু পায়ে। বড় বড় পা ফেলে পাড়া কাঁপিয়ে এলো প্রস্তাব পরিকল্পনা আর প্রতিশ্রুতির বান।

ঢাকায় থাকতে যারা পেয়ার আলিকে সস্তায় নিজের ক্ষেতের লংকা গুড় আর নারকোল যোগাতো তাদের একটা দল এসে পড়লো বোয়াল-মারির চরে। কিষাণের অভাবে পেয়ার আলির যে জমি এতদিন প্রায় অনাবাদী পরে থাকতো, সে জমিতে লাঙ্গল পড়লো। তিস্তার পলি মাখা চরের উর্বর জমিতে এলো সবুজের সুষমা।

অঘ্রাণের আশ্বাস উঠলো। শ্রাবণের উথাল পাথাল হাওয়ায় সে আশ্বাস দোল খেতে লাগলো সবুজ টিয়ার চঞ্চল লেজের মতো।

চরের পূব পাড়ের যেখানে ছিন্নমূল মানুষের নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে সেখানে গৃহস্থ ঘরের উঠোন দুবেলা নিকানো হতে লাগলো। বাড়ীর উঠোনে পোঁতা ঝিঙ্গেগাছের গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে হলুদ ফুলের রঙ্গীন সমারোহ কচি বউ ঝিয়েদের মন ভুলালো। ঘরের ভিতর তৈরীর জন্য মাটি তুলে যে বড় গর্ত হয়ে রয়েছে তাতে জল জমে নতুন কলমি শাকের বাড় বাড়ন্তে অনেকের স্মৃতির পটে ফেলে আসা দিনের কথা ছবির মতো ভেসে উঠলো। যারা বার্ধক্যের ভারে অক্ষম হয়ে ঝিমুনি কাটছিল তাদের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো।

নদীর নীচু পাড় থেকে পেয়ার আলি ধীরে সুস্থে উপরে উঠে এলো। রঙ্গীন নক্সা কাটা লুঙ্গির উপর সাদা ফিন ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, তার উপর হাত কাটা গরম কোট, বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি। আলি সাহেবের বয়স কত হলো। চল্লিশ, বিয়াল্লিশ কিংবা দু এক বছর আগু পিছু। ঘন বাবড়ী চুল উলটো করে আঁচড়ানো, দু এক এক গাছিতে নতুন পাক ধরেছে সারা গালে মসৃণ দাড়ি. মেহদি মাখা দাড়ির উপর সূর্যের রশ্মি পড়ে চিক্ চিক্ করছে। ঘন জলা ঘাসের আড়ালে যেমন জলা ভূমির গভীরতা আন্দাজ করা যায় না, তেমনি ঘন কালো গভীর দাড়ির ফাঁকে আলি সাহেবের গাল টোল খেয়েছে কিনা বোঝা যায় না। উপর পাটির সামনে দুটো দাঁত হিন্দু বিগ্রহের চোখের মত সোনায় বাঁধানো, হাসলে সবার আগে সে দুটোর উপর নজর পড়ে। বাঁ হাতের আঙ্গুলে তিনটা আংটী। গুরুত্ব দিয়ে কথা বলার ও শোনার সময় বাঁ-চোখ ঈষৎ ছোট হয়ে আসে।

তবে পেয়ার আলি প্রাণ খুলে হাসতে পারে। যখন হাসে তখন সদ্য জল থেকে ওঠা হাঁসের গা ঝাড়ার মতো পেয়ার আলির সমস্ত শরীর কাঁপে।

পেয়ার আলি গরম কোটের পকেটে ডান হাত গলিয়ে কি যেন একটা অনুভব করে তৃপ্তির হাসি হাসে। পাতলা কাগজে মোড়ানো সোনার নাকছবি। আগে কোন দিকটা সারবেন ভেবে নিয়ে পেয়ার সাহেব পুব পাড়ার দিকে পা চালায়।

পেয়ার আলির ভাবনা জমেছে সকাল থেকে, কি হলো, দুদিন থেকে একটারও কাজে যাবার নাম নেই।

নদীর পাড় ঘেঁষে নীচু জমিটা পুব পাড়ার লোকেরা যেখানে খাস জমি বলে, তার কিনারা দিয়ে নদীর বরাবর মাটি কেটে বাঁধ উঠছিল। এই সময় না তুললে বর্ষার আগে আর সময় পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া এ সময় কামলা খাটাবার খরচ অনেক কম। পুব পাড়ার মানুষ গুলোকে পনেরো দিন আগে থেকেই কাজে নামানো গিয়েছিল। কাজও চলছিল বেশ। যারা জিদ ধরেছিল যাবে না তাদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়, ও কটা শালা নিতাই আমজাদের দলের লোক। পেয়ার আলি বোঝে যারা মাটি কাটতে যায় তারা কেউ স্বেচ্ছায় যায় না, নিতাই আমজাদের পরিণতির আর পরিবারের আর পাঁচটা নিরন্ন প্রাণীর কথা ভেবে যায়।

আশ্বিনের প্রথম থেকেই পেয়ার আলি ঘন মোলায়েম দাড়িতে হাত বুলিয়ে সবুজ জাজিমের উপর কালো শুয়াপোকার মতো কি যেন শুঁকে বেড়ায়। আশ্বিনের শেষের দিকে দাপাদাপি বাড়ে। দুধেল গরুর বাট ঘিরে সদ্য বিয়ানো বকনার দাপাদাপিতে আলি সাহেবের কষ বেয়ে

পানের পিচ্ছিল রস নামে, বলি দেয়া কালো পাঁঠার ঘাড়ের কালো লোমশ জমিনে ছিট্‌কে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বিন্দুর মতো।

সোনা বরণ ধানে বোয়াল-মারির চরের বিশাল প্রান্তর অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হয়ে ওঠে স্বর্ণময়, ফসলের ভারে গাছ নুয়ে পরে মাটিতে। নতুন বউ ঘরে ওঠার আগে যেমন শ্বাশুড়ী ঠাকুরণকে গড় হয়ে প্রণাম করে ঠিক তেমনি সারা চড় জুড়ে ধান নতজানু হয়ে থাকে, নিঃশব্দে কার যেন আশীর্বাদ মাগে। প্রথম শীতের শিশির জমে, ভোরের আলোয় সেই শিশির জ্বলে ওঠে। শাশুড়ী ঠাকুরণের হীরের নথ দিয়ে নতুন বউএর মুখ দেখা সার্থক হয়।

এক সময় ধান ওঠে। তবে পুব পাড়ার গোবর নিকানো উঠানে নয়, ধান ওঠে নকিবুদ্দিনের গোলা বাড়ীর শান বাঁধানো সাফ সুফ কঠিন চত্বরে। পেয়ার আলি একটা বেতের মোড়ায় বসে সব তদারকি করে। নাওয়া খাওয়ার সময় যায় গড়িয়ে। শুধু হিসাব আর হিসাব, কত ধানে কত চাল।

পুব পাড়ার সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিকর্তাদের ভাগে যা জোটে তার হিসাব আর পেয়ার আলির বিরাট সংসারের সারা বৎসরের মুড়ি চিড়া বাবদ আলাদা করে রাখা ধানের হিসাবের মধ্যে দূরত্ব থাকে না বিশেষ।

পুব পাড়ার মানুষ, হিন্দু মুসলমান চাষীরা বোঝে, আলি সাহেব ঢাকায় যে ভাবে নারকেল গুড় আর মরিচের ব্যবসা করতো, এখানেও সে ভাবে ধানের ব্যবসায় নেমেছে।

ইতিমধ্যে তিস্তা দিয়ে অনেক অনেক জল গড়িয়ে গেছে। বার তিনেক হাত পা ছড়িয়ে বান ডেকেছে। প্রথম বসতির বছরে রোপা আম,

কাঁঠাল, সুপারী গাছে গত দু এক বছর থেকে ফল আসছে। ওপার থেকে জরা ব্যাধি নিয়ে যারা এসেছিল তাদের বেশীর ভাগ গেছে শ্মশানে কিংবা কবরে। বাকি যারা আছে তারা যাবো যাবো করছে, যারা যুবক ছিল তারা ছেলে পিলে নিয়ে সংসার পেতেছে। সেবার আকালের বছরে চালের দাম উঠলো তাল গাছের ডগায়। দু মুঠো চালের জন্য গ্রামের মানুষ চরকির মতো ঘুরছে। গ্রামের মানুষ চালের জন্য মিছিল করে শহরে এলো। পুলিশ চালালো গুলি। তাতে যে সাতজন প্রাণ দিল তার মধ্যে পূব পাড়ার হোসেম মিঞার বড় ছেলে জিরাত ছিল। নিতাই পালের পায়ে লাগলো গুলি, প্রাণে গেল বেঁচে। সবাই বুঝলো পেটের জন্য, পূব পাড়ার সবার জন্য, গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে জিরাত আলি।

নকিবুদ্দিনের সম্পত্তির উপর থেকে পেয়ার আলির একচ্ছত্র আধিপত্য গেল। নকিবুদ্দিনের তিন বিবি ভাগ হয়ে গেল। স্বনামে বেনামে পেয়ার আলি যা হাতড়ালো তার পরিমাণ খুব একটা খারাপ নয়। নিজের নামে আইন বাঁচিয়ে মাত্র সত্তর বিঘে।

মাঝখানে দু বছর সারা দেশ জুড়ে কি সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে গেল, যার তাপে সারা দেশের কিষাণের সাথে পূব পাড়ার কিষাণদের গায়ে তাপ এলো। থানার বড়বাবুর জন্য পুকুরের পাকা ছয় সেরী ওজনের রুই মাছের সাথে দুটো ডাগর মুরগা তোফা পাঠিয়েও কাজ হলো না। পেয়ারের বিবি ফুলবানুর নামে লুকিয়ে রাখা পেয়ারের জমিও পেয়ার আলি হাতের মুঠোয় রাখতে পারলো না। পূব পাড়ার আশ্রিত হাবাগোবা কিষাণগুলো পেয়ার আলির চোখের সামনে তাতে রোয়া গেড়ে অগ্রহায়ণের শেষে সোনা তুললো পূব পাড়ার গোবর-নিকানো উঠানে।

পেয়ার আলি মামলা করলো, রায় পেলো পূব পাড়া। পেয়ার আলির চোখের সামনে বোয়াল-মারির চরের মানুষগুলো কেমন যেন বদলে গেল।

থানার বড়বাবু পেয়ার আলির কানে ফিসফিসিয়ে বললো—আলি সাহেব আর কটা দিন মুখ বুজে থাকুন, ঘাপটি মেরে থাকুন, ফিরে আবার এলাম বলে। আলি সাহেব ট্যাঁকে হাত দিল, বড় বাবু হাত চেপে চাপা গলায় বললো—ব্যস্ত হবেন না আলি সাহেব, তোফা দেবার সময়তো আর বয়ে যাচ্ছে না, অবস্থা বুঝে মেয়ের বিয়ের দিন পাকা করবো, আপনি থাকতে মেয়ের বিয়ের মাছ মাংস কিনবো ভেবেছেন ?

আলি সাহেব কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে বলেছে, " সে দিন য্যান আসে বড়বাবু, মানুষগুলোর বড় বাড় বাড়ছে।'

পরে আলি সাহেব বড় বাবুর দূরদর্শিতার কথা ভেবে আল্লার কাছে বড়বাবুর পবিত্র জীবন দোয়া মেগেছে।

বছর দুই হলো আবার অবস্থাটা মোড় নিয়েছে। সব জমি ফিরে পাওয়া যায়নি, কিন্তু মানুষগুলোকে, যাদের বাড় বেড়েছিল তাদের বেশ চড়িয়ে নেয়া যাচ্ছে। অবশ্য এর জন্য বড়বাবুর তোফার বহরটা মাছ ও মুরগীর থেকে নগদ লেনদেনে উঠেছে। আগে মানুষগুলোকে কাবু করতে পারলে, জমি নিতে কতক্ষণ। পূব পাড়ার জোয়ানরা, যাদের তেজ আবার একটু বেশী ধরণের তাদের গরু, ছাগল চুরির দায়ে, গ্রামের শান্তিভঙ্গের দায়ে নিয়মিত কোর্ট, হাজতে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সব সময় যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। গরু, ছাগল চুরির দায়ে পাঠিয়ে যাদের বিশেষ কাবু করা যাবে না, তাদের মধ্যে দলের

দুই পান্ডা গুলি খাওয়া নিতাই আর রহিমদ্দিনের ডাগর ছেলে আমজাদ-কে পাঠানো হয়েছে মানুষ খুনের দায়ে। ওরা বছর দুই হলো আটক আছে কলকাতার বড় জেলে।

ও দুটোকে দেখলে আলি সাহেবের বুকের পানি খালি হয়ে যেত, শুধু আল্লার নাম স্মরণ হতো। নিতাই আর আমজাদ মন্ডলঘাটের হাইস্কুলে পড়াশুনা করা ছেলে। ওরাইতো বাকিগুলোর মাথা খেল না হলে পেয়ার আলির কিসের ভয় ছিল এ গ্রামে। থানার বড় বাবুর কাছে যখন শুনলো বেত্তমিজ দুটোকে কলকাতার বড় জেলে পাঠানো হয়েছে তখন পেয়ার আলির বুকের উপর থেকে একটা ঠান্ডা পাথর গেল নেমে। আল্লা তার উপর দোয়া করেছেন এই বিশ্বাসে বুক ভরে ওঠে।

বাঁধের কাজটা চলছিল বেশ, কিন্তু গত দুদিন থেকে যে কি হলো, একটা কামলারও পাত্তা নেই, সব কি মরে ভূত হয়ে গেল নাকি? এই অস্বস্তিতে পেয়ার আলির চোখে সুরমা গায়ে আতর মেখে এ পাড়ে আসার অর্ধেক ফুর্তিই মাটি হয়ে গেল। এদের একটু ধমকে আবার যেতে হবে ও পাড়ার আইনুল হকের বাড়ী। হক সাহেবের বড় মেয়ে হাসিমার কথা মনে হতেই পেয়ার আলির বুকের ভিতরটা আবার অল্প জলে জিইয়ে রাখা জিয়ল মাছের মতো থলবলিয়ে উঠলো।

সজনে, আম, নিম, সুপারী ডুমুর ছাওয়া পুবপাড়ার খানিকটা ভিতরে ঢুকে, এ পাড়ার সব চেয়ে বয়স্ক কর্মদক্ষ মানুষ তারাপদর বাড়ীর সামনে এসে একটু দাঁড়িয়ে পেয়ার আলি হাঁকলো—"তারা বাই বাড়ীতে আছো নাকি?

ভিতর থেকে বয়স্ক ভারী কণ্ঠে আওয়াজ এলো—"ক্যাডা? আলি সাহেব নাহি, আহেন আহেন।"

বাড়ীর ভিতর থেকে কিঞ্চিৎ পঞ্চাশ-উর্ধ একটা কালো সবল মানুষ গায়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে বেড়িয়ে এলো—"আদাব আলি সাহেব, ভিতরে আহেন।"

পেয়ার আলি গোবর নিকানো তক্‌তকে উঠানের উপর উঠে এলো তারাপদর বিধবা বোন রান্না ঘরের খোলায় মুড়ি ভাজছিল, ওঠে গিয়ে একটা বেতের মোড়া এনে উঠানে রেখে আবার রান্না ঘরে ঢুকলো।

পেয়ার আলি এই ফাঁকে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। দেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই বাঁ চোখের পাতা দুটো ঈষৎ বুজে এলো। এক মুহূর্ত ব্যস। সামলে নিয়ে মোড়ায় বসে বললো—, কি তারা বাই কাউরো নিকার পঞ্চায়েত বহাইছ নাহি? পাড়ার ব্যাবাকটিরে যে এহানে দেহি।

গত দুদিন থেকেই এ রকম পঞ্চায়েত বসছে সারা পাড়া জুড়ে। মানুষগুলোর ধমনীতে আবার যেন রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে। যারা ভয় পেয়েছিল তারা আবার সাহস ফিরে পাচ্ছে। আবার নিশ্বাস প্রশ্বাসের তোড়ে চরের হাওয়া কাঁপছে। এ দুদিনে একবারের জন্যও পেয়ার আলির জমিতে বাঁধ দেবার কথা কারো মনে হয় নাই। এই মাত্র পেয়ার আলিকে দেখে সবার মাটি কাটার কথা মনে হলো। কিন্তু অন্য দিনের মতো এর জন্য অপরাধ বোধ, সংশয়, কিংবা দ্বিধায় কারো বুক কাঁপলো না।

সবার হয়ে তারাপদ বললো—দুই দিন ধইরা একটু মাইত্তা আছি মিঞা সাহেব। পেয়ার আলির বুকের ভিতরটা অজানা আশংকায় ছম্মাৎ করে উঠল, বাঁ চোখটা, ঈষৎ বুজে এলো!

তারাপদর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল গুলি খাওয়া নিতাই-এর দাদা কানাই। সে হেসে বললো—গত সুমবার আমাগো হারাণের পরিবার একটা পোলা বিয়াইছে, আগের তিনটাতো পেডেই মরছিল, হিয়ার লেইগ্‌গা হারাণ আমাগো কাইল খাওয়াইলো। মাটি কাইটবার লেইগা যামু যামু কইরা আর যাইবার পারলাম না।

পেয়ার আলি এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল। উপলক্ষ্যটা নেহাৎই উপেক্ষা করার মতো শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রাণ খোলা হাসলো। তারাপদর উঠানে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর নজর গিয়ে জমলো উপর পাটির সামনের দুটো দাঁতের উপর।

হাসির দমকের রাস টেনে পেয়ার আলি বললো—আইজ কি হারাণের গরু বিয়াইছে নাহি।

পেয়ার আলির কথা শুনে এবার সবাই হাসলো, রান্না ঘরে মুড়ি ভাঁজার ফাঁকে, তারাপদর বিধবা বোন মালতী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসলো।

হারাণের পাশে বসা রোগা ফণী বললো—"আইজ সবাই মিইল্লা কাণ্ডেশ্বরী বিলডারে জাঁকাইলাম।

মাছনি পাইলা কিছু?

পেয়ার আলির গলা জল

"তা খারাব হইবো না, ছোট গুলান আমরা ভাগে নিছি, বড় গুলান পরাণ আর সুবলেরে দিয়া হাটে পাঠাইছি।"

পেয়ার আলি কৈফিয়ত চাইলো না। দুদিনের আচমকা অনুপস্থিতির কারণের নিড়ানিতে বুকের ভিতরে গজিয়ে ওঠা অস্বস্তির অংকুর বিনষ্ট হলো।

গলায় রসিকতার সুর জিইয়ে রেখে বললো—একদিন হারাণের ঘাড় মটকাইলা, একদিন বিল জাঁকাইলা, কিন্তু আমার বাঁধের কি গতি হইবো ?

জড়ো হওয়া কিষাণগুলোর মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ যদু বলতে যাচ্ছিল —'মিয়া সাহেব আমরা আর বাঁধের কাজে যামু না। কাইল হগলে মিইলা ঠিক হইছে।" কিন্তু যদুর গলা খাঁকারি নিয়ে সুরু করার আগেই আমজাদের বাবা রহিমুদ্দিন বললো—মিয়া অত তাড়া কিসের। আমরা থাইকতে বাঁধের লাইগা ডড়ান ক্যান। হগলে মিইলা ম্যালা করলে একদিনের কম্ম।

আলি সাহেব মোড়া ছেড়ে উঠে শরীরে একটা মোচড় দিয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে বললো—ভাবি আর কই। আল্লার নামে বেবাক ছাড়ছি, ঐ খান দিয়া পানি ঢুকলে ছোটগো পাঠশালাডাও ডোবে, এ্যার লেইগা তাড়া করি।

রাস্তাটাকে ছোট করার জন্য পেয়ার আলি পুব পাড়ার উঁচু রাস্তা থেকে জমির আলে নেমে, ডান হাতে লুঙ্গিটা একটু উঁচু করে তুলে বড় বড় পা চালায় আইনুল হকের বাড়ী। যাবার রাস্তাটা যদি আরো ছোট করা যেত তবে পেয়ার আলি আরো স্বস্তি পেত।

হক সাহেব ধর্ম ভীরু সহজ সরল মানুষ। জামাই হিসাবে হক সাহেব আমজাদকে পছন্দ করে বেশী, কিন্তু আলি সাহেবের ঘরে গেলে হাসিমার কোন দিন ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। হক সাহেব ধর্ম ভীরু মানুষ, মন চায় মানে আল্লা চান, তার একমাত্র মেয়ে আমজাদের ঘরে যাক। আবার ভাবনা হয় আমজাদের বাপ রহিমুদ্দিনের হাতে

মাত্র ছয় বিঘা জমি। বাকিটা পেয়ার আলির জমি আধি করে। আমজাদ কি পারবে হাসিমাকে সুখী করতে। পেয়ার আলি এখনো দশটা নিকা করতে পারে। আমজাদ ছেলে বড় ভালো। আমজাদকে দেখলে মন বলে আল্লা হাসিমা আমজাদকে কলমা পড়াও। সেবার ছেলেটার তেজেই না পেয়ার আলি অমন কেচোঁ হয়ে থাকলো। কাল্ডেশ্বরী বিলের পাড়ে যে বাইশ বিঘা জমি বের হলো তার থেকে হক সাহেবও বিঘা দুই পেয়েছিল। তার পর বছরই খুনের দায়ে নিতাই-এর সাথে আমজাদও গেল জেলে পচতে। হক সাহেব মনে বড় ব্যাথা পেয়েছিল। একদিন সাহস করে শুধিয়ে ছিল—আলি সাহেব কামডা ভাল করলেন ? পেয়ার আলি ইংগিতটা বুঝতে পেরেছিল। নিরুত্তাপ কণ্ঠে কাওকে উদ্দেশ্য না করে জবাব রেখেছিল, সবই আল্লার ইচ্ছা।

এসব বছর দুয়ের পুরোনো কাসুন্দি।

পেয়ার আলি কলাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁকলো—"হক সাব্ বাড়ী আছেন নি।

ডাক শুনে কলার ঝোপের আড়াল থেকে ফর্সা গায়ের রঙ, সাদা পাকায় খেলানো এক মাথা চুল আর এক মুখ দাড়ি নিয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছির একটা সরল মানুষ বেড়িয়ে এসে, আলি সাহেবকে দেখে সরল হাসিতে মুখ ঘুরিয়ে বললো—আদাপ আলি সাহেব, আহেন আহেন ভিতরে আহেন।

হক সাহেবের আজকের ফুর্তি মাথা মুখটা দেখে পেয়ার আলি ভাবলো আইজ-ই পাকা কথাডা পারুম নাহি; বার বার ঘুরন আর ভাল ঠেকে না। আইজ-ই পাকা কথা নিয়া মেলা করুম।

হক সাহেব পেয়ার আলিকে বসার জন্য একটা জল চৌকি এনে দিল। আলি সাহেব তাতে বসে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বিস্মিত হলো। রান্না ঘরের মেঝেতে হক সাহেবের বিবি শিল পাটায় চাল গুড়ো করছিল। আলি সাহেবের উপস্থিতিতে মাথার উপর কাপড় টেনে দিয়ে যেমন চাল বাটছিল তেমনি বাটতে লাগলো। চাল বাটা হচ্ছে দেখে আলি সাহেব বেশ আশ্বস্ত হলো। বাড়ীতে পিঠেপুলি হবে। আনন্দময় পরিবেশ। হক সাহেব আজ খোস মেজাজে আছে। কথা পাড়ার আজই মোক্ষম দিন। ডান পকেটে হাত দিয়ে পেয়ার আলি পেয়ার মাথা আঙ্গুলে নাকছবিটার স্পর্শ নিয়ে চোখটাকে শিকারীর মতো চারিদিকে বুলিয়ে বললো—

বাড়ীটা যেন খালি খালি লাগে।

হক সাহেব পানে চুন মাখিয়ে আলি সাহেবের হাতে দিয়ে বললো—

হাসিমার কথা আর কইয়েন না, মিয়া সাহেব, কাইল থনে আমিইনি ভালো কইরা মাইয়াডারে দেখছি।

ক্যান, হাসিমার হইছে কি ?

কাইল কইলকাতার জেইল থনে আমাগো নিতাই আর আমজাদ বেকসুর খালাস পাইয়া আইছে না"

পেয়ার আলি হঠাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে আকাশ ফুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইলো—কিন্তু পারলো না। কোমরে একটা অসহ্য টান লাগলো। মাজার পুরানো ব্যাথাটা আবার বহুদিন পরে চাগিয়ে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে কি যেন একটা বললো—কিন্তু শোনা গেল না। শুধু দাঁতের চাপে একটা কড় কড় আওয়াজ উঠলো।

পেয়ার আলি রাতটা এ পাড়ের ছোট শ্যালক আজিজুলের বাড়ীতে কাটাবে বলে মনস্থ করে এসেছিল—আগে থেকে খবর দেয়া ছিল। হয়তো এতক্ষণে মুরগী জবাই হয়ে গেছে। শহরের আসলী মাল ছাড়া পেয়ার আলির তেষ্টা ঘোলে যে মেটে না সেটা আজিজুলের জানা আছে। কিন্তু শীতকে উপেক্ষা করেই এই ভর সন্ধ্যায় সব খুলে রঙ্গীন লুঙ্গিতে বেঁধে টোপলা করতে হলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বোয়াল - মারির চর ঘেষা ছোট্ট নদীর জলে কল কলিয়ে ঢেউ উঠলো। বোধ হয় একটা পাকা বোয়াল জল কেটে ওপারে চলে গেল।

সন্ধ্যা নামলো। মাঘী পূর্ণিমার আর কদিন বাকি ? দুদিন থেকে এসবের হিসাব রাখা দায়। জ্যোৎস্না তেমন অবাধ্য নয়। ঢপ্ ঝুমুরের আসরে গ্রামের সব চেয়ে ভীরু, সলজ্জ বধুর অন্যের গা বাঁচিয়ে জায়গা করে বসার মতো চাদের আলো নামে ডাগর গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে আড়ালে, হাসিমা জ্যোৎস্না ধরেই ডোবার ঘাটে এগিয়ে যায়। ঘাটের মুখের বাঁদিকের মোটা জিকা গাছের গোড়ায় একটা ছায়া মূর্তি কেঁপে ওঠে। হাসিমা ক্ষণিক থমকে দাঁড়ায়।

ছায়া মূর্তি দুই পা এগিয়ে এসে বলে—ডরাইলেন নাকি বিবিজান।

হাসিমার মুখে কথা সরে না

ছায়ামূর্তি আরো দুপা এগিয়ে এসে স্পষ্ট হয়। আমি তো ভাবছিলাম আপনার লগে মোলাকাত করণের লাইগ্যা আলি সাহেবের পীরদরগায় সিন্নি মানত করন লাগবো

হাসিমা এবার নড়ে ওঠে—ক্যান, ভাবো নাই জেল থনে আইয়া হাসিমার কবরে রোজ সাঁঝে চিরাগ জ্বালবা।
দুই বছরে দ্যাশের তামান জিনিষ বদলাইছে কিন্তু আমাগো বিবিজানের চিরাগ দেখি টুবু টুবু"
হু ! আলি সাহেবের পদসেবা করুম বইলা জমাইয়া রাখছি !

ছায়া মূর্তি আরো এক পা এগিয়ে এসে হাসিমার চিবুকটা তুলে ধরে। চিবুক ধরা হাতের উপর কয়েক ফোটা তাপলাগা জলের ফোটা নেমে আসে।

—হাসিমা আমি যা ভাবছি তাই হইল। চরের একটা মানুষও আমারে নিতাইরে ভোলে নাই। তুমিও ভোল নাই। গেলে কয়াকি জানো হাসিমা, তোরা ফিইরা আইছস, আমরা বুকে বল পাইছি, এইবার নদীর ধারের নামা জমিতে আমরা হগলে মিইলা রোয়া গাড়ুম, কথাডা শুইনা আমি চোখের পানি রাখবার পারি নাই। মনে মনে কইছি এই চরের মানুষের লেইগা আমি সারা জীবন জেলে পচবার পারি।

হাসিমা আমজাদের বুকের উপর মাথা রেখে নারীর চিরন্তন আনন্দ, আশাকে সহ্য করে রাখবার জন্য কান্না জড়ানো গলায় বলে, তুমি একশোবার জেলে যাও, তাতে আমার অগরব নাই, দুঃখ নাই, কিন্তু তার আগে আমারে তুমি পেয়ার আলির থাবার থনে মুক্ত কর।

পূব পাড়ার কে যেন গলা ছেড়ে গান গায়। তার সুর হাওয়ায় ভর করে কেঁপে কেঁপে আসে।

আলোর মানুষ

পল্লব কান্তি রাজগুরু

কোথা থেকে ছুটে এসে পেরেকে টাঙ্গানো জামাটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে গেল অমল। বাইরে অপেক্ষা করছিল তার বন্ধুরা। ওরা যাবে ভিন গাঁয়ে মুরগী লড়াই দেখতে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে আল পথ. জলা পথ ভেঙ্গে ওরা যাচ্ছে। অল্প বয়স সকলেই তাই প্রাণ-চঞ্চল, ভীষণ দুর্বার। চলার পথে তাই কথার ফুলঝুরি ঝরছে আর ঝরছে। কিন্তু তারই মধ্যে অমল যেন কেমন মনমরা, একক চিন্তার সাথে নিজস্ব সংলাপ রচনায় ব্যস্ত। কখনো দ্রুত লয়ে, কখনো ছুটে তারা পথকে পিছনে ফেলে চলেছে সামনে। হঠাৎ অমলের বেদনার্ত চিৎকার, সঙ্গীরা পিছনে তাকিয়ে দেখে ভূ-সংলগ্ন অমল। কাঁটা বিঁধেছে তার পায়ে। সবাই এগিয়ে এল তার কাছে। নাগবেনী কাঁটাটা জোর করে তুলে দিল ঋষি। অমল তখনও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ঋষি বলল,—কি রে, দেখে পথ হাঁটিস না কেন?

অমল উত্তর দিল না—শুধু মুখটা একটু ব্যাজার করল।

আবার ওরা চলছে। অমল খুঁড়িয়ে চলছে। তাই সকলের চলার গতি একটু শ্লথ।

অমলের দিকে তাকিয়ে ঋষি বলল—কিরে কথা বলিস না কেন? কি হয়েছে তোর।

এই প্রথম অমলের বাক্ প্রকাশ, বলল না কিছু না। একটু থেকে দিগন্ত প্রসারী পাকা ফসলের মাঠ ও উর্ধ্বনীল আকাশের দিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে অমল বলল গাজন কবে রে ঋষি?

ঋষি বলল—সে তো দুমাস বাকী, এখনই তার খোঁজ কেন?

'আচ্ছা' এখন চলো তাড়াতাড়ি না হলে লড়াই দেখা যাবে না ওরা এখন পদচারণার গতি বাড়াল।

সবাই হাঁটছে, অমলও হাঁটছে, কিন্তু মনটা আবার আনমনা। কিছুদিন যাবৎ ওর এরকম হচ্ছে। অমলের বাবা মারা গেছে কিছুদিন আগে। ওর বাবা কিরণ খুবই ডাকাবুকো, সাহসী ছিল। গ্রামের গাজন উৎসবে কিরণই রাত গাজনের দশমুখী বানটা নিত। সর্বাঙ্গের দশটা জায়গায় বেঁধা থাকত ঐ বাণের দশটি মুখ। বাণের মুখে দেওয়া হত ঘি ভেজা তুলোর আগুন। তাতে বেঁধা জায়গার আরাম হয়। কিরণকে ঘিরে কত মানুষ। ঢাক-ঢোলে মুখর চারিদিক। গ্রামের এবং বাইরের অনেকে দশমুখী বাণেবিদ্ধ কিরণকে দেখতে ব্যস্ত। এইরাতে কিরণ যেন যে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির মতো। অমল বাবার সাহস ও শৌর্য দেখে

সম্মোহিত হয়ে যেত। কিরণ একাদিক্রমে প্রায় পনের, ষোল বছর এই দশমুখী বাণ নিজের শরীরে ধারণ করে। এতদিন বাবা ভৈরবের নামে এই শারীরিক নির্যাতন ভোগ করে একটা পারমার্থিক তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এই বিষয়টাই কিরণের মৃত্যুর কারণ। সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ফোঁড়াফুঁড়ি শরীরে পুঁজ জমেছিল আর যার পরিণতি কিরণের মৃত্যু। সে সময় কিরণের স্ত্রী সুরমা বাবা ভৈরবের কাছে নিরম্বু ধর্ণা দিয়েও কিছু করতে পারে নি। বেহুলার মতো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেনি সে। অমল তার বাবার বীরত্ব একসময় যেমন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত ঠিক তেমনি বাবার মৃত্যুকালীন দারুণ যন্ত্রণাও উপলব্ধি করেছে।

এতক্ষণে অমলরা মুরগী লড়ায়ের মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে এইখানে। হৃষ্টপুষ্ট মুরগী পায়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে পরস্পর লড়ছে। আর মানুষের পুলকিত উত্তেজনার সে কি রূপ। অমল কিন্তু এই উত্তেজনার আগুনে নিজেকে উত্তপ্ত করতে পারছে না। এইরকম একটা বাস্তব চলচ্চিত্রের থেকে সে বারবার ছিটকে পড়ছে অন্যত্র—একাকী নিজস্ব ব্যক্তিগত চিন্তার মোড়কে নিজেকে গুটিয়ে রাখছে সে। ইদানিং খুব বেশী অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছে একদা প্রাণচঞ্চল অমল।

এবছর উত্তরাধিকার সূত্রে অমলেরই দশমুখী বাণটা নেওয়ার কথা। কারণ, এ বিষয়টা ওদের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। এরকমই নিয়ম প্রচলিত আছে অনেক কাল যাবৎ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে

পারিবারিক এমনকি গ্রামের দারুণ অমঙ্গলের আশংকা। এতসব জানা সত্বেও অমল কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে নি দশমুখী বাণ নেবার জন্য। ওর মনে প্রশ্ন আছে, আছে দ্বন্দ্ব। কি হবে ফুঁড়ে শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করে? কি হবে গরীবের বিশেষতঃ যাদের জীবনে জনমজুরী খাটাই একমাত্র পেশা তাদের শরীরকে শেষ করে? যদি বাণ সে না নেয় তা হলে এমন কিই বা ঘটবে? এইরকম চিন্তা এখন ওকে বিদ্ধ করছে বার-বার। নিজের ব্যক্তিগত চিন্তার মধ্যেই সমাধান সূত্রের আভাস পেয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চায় সে। একদিন এইরকম চিন্তা করতে গিয়ে নিজের উপর ঠিক আস্থা না পেয়ে অমল ছুটে গেল সুরমার কাছে। হয়তো নিজের চিন্তার দোসর খুঁজে পেতেই তার এই প্রয়াস। সুরমাকে জিজ্ঞাসা করল অমল, 'মা, বাবা তো মারা গেছেন, এবার গাজনে দশমুখী বাণটা কে নেবে' ?

—কেন, তুই নিবি। বাবা ভৈরবের কাছে এতো আমাদের বংশের মান-সিক। কি রে, পারবি না?

—না মানে, আমি বলছিলাম যে, যদি না নিই তাহলে কি হবে?

—একথা বলিস না কখনো, বাণ না নিলে বংশ আর গ্রামের নিদারুণ অমঙ্গল হবে। তোর বাবা মৃত্যু শয্যায় বলে গেছে এ বাণ যেন অমল নেয় প্রতিবছর।

—দূর তুমি কিছু জানো না, মন গড়া সব অমঙ্গল চিন্তা, এভাবে শরীরকে ছিঁড়েখুঁড়ে কি মোক্ষলাভ করা সম্ভব।

—এত সব জানিনা বাপু, একাজে অন্যথা করলে অমঙ্গল হয়, তাই বুঝি। রাগতঃ মেজাজে কথাগুলি বললেন সুরমা।

অমল উঠে বাইরে গেল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। সুরমার কথায় কোথাও কোন যুক্তি নেই, তবুও এতবড় একটা বিশ্বাস অবলম্বন করেই তো সুরমা তার স্বামীর মৃত্যুকে পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে মেনে নিয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও বিশ্বাসে চিড় ধরেনি, একমাত্র ছেলে অমলকে দশমুখী বাণ ধারণ করাবার জন্য সচেষ্ট। অমলকে তাই ভাবতে হচ্ছে মা'য়ের কথা। সে কথায় যুক্তি নেই, কিন্তু অটুট বিশ্বাস আছে, যুক্তির আলোতে হয়তো তা আলোকিত নয়। চিন্তায় পড়ে গেল অমল। মা'য়ের কথা মনে হতেই একটু হাসলো। সে হাসি ভয়ংকর অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের হাসি না নিছক মানসিক গুমোট্ ভাবটা ঝেড়ে স্বাভাবিক হবার প্রয়াস, কে জানে।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলছিল অমল। চলতে চলতে রামানুজ মাষ্টারের বাড়ীর সামনে ওর গতি স্তব্ধ হল। দু'চার মিনিট দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর সোজা 'মাষ্টারমশাই' বলে ভিতরে ঢুকে গেল। রামানুজ, অমলকে খুব স্নেহ করত। অমলদের পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানত। তাই স্কুলে না যেতে পারার জন্য তাকে সে বিশেষ কিছু বলত না। পরন্তু মাঝে মধ্যেই অমলকে ডেকে নিয়ে নানা রকম অবাক করা গল্প বলত। শুনত, আর অমলের জানার লোভী জিহ্বা আরো প্রসারিত হত। রামানুজ তাকে মানুষের বিবর্তনের কথা বলত, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের কথা বলত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ অভিযান সম্বন্ধে বলত, সমাজ সংসারের

কথা বলত। দারিদ্র্যের কথা বলত, কেন কি ভাবে দারিদ্র্য আসে সে কথার সাথে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কি ভাবে লড়াই করতে হয় সে কথা বলত। অন্যায়, অত্যাচার, সামাজিক শোষণ, নিষ্পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা মানুষকে অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, কুসংস্কার আর অন্ধত্ব ত্যাগ করে যারা মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে সেই সব মনীষীর গল্প শোনাতো পরম স্নেহ বশতঃ। এই সব গল্প শুনতে শুনতে অমল রোমাঞ্চিত হত। তার বোধ ও মেধা ক্রমশঃ চকচকে হয়ে উঠত। শ্রদ্ধানবত অমল, তার সমস্ত অস্তিত্বের উপর আট করে বসিয়ে দিল রামানুজের অকৃত্রিম ছবিটা। মা'য়ের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় অমলের, রামানুজের কথা মনে এসেছে। রামানুজের যুক্তিবাদী মতামতের উপর সে অত্যন্ত আস্থাবান।

রামানুজ একটা বই নিয়ে তখন বসেছিল। অমলকে দেখে তাঁর সপ্রতিভ জিজ্ঞাসা 'কি রে, কি ব্যাপার?

একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এলাম, স্যার।'

স্মিত হেসে রামানুজ বলল, 'বল না, কি কথা।'

আচ্ছা স্যার, আপনি তো জানেন, বাবার বর্তমানে দশমুখী বাণটা এবার গাজনে আমারই নেওয়ার কথা। কিন্তু, আমি একাজে যুক্তি ও উৎসাহ পাই না, তাইতো বাণটা আর যে খুশী নিক, আমি নেব না। আপনি কি বলেন?—অমলের জিজ্ঞাসা প্রসারিত হল রামানুজের দিকে।

রামানুজের উজ্জ্বল দৃষ্টি অমলের দিকে; বলল, 'এতো

মারাত্মক যুক্তি খাড়া করেছিস তুই। বিষয়টা কাল-পুরাতন তাই জটিল। যারা এসব উৎসবের আয়োজন করেছিল তারা সব বর্ণগোষ্ঠীর লোক কিন্তু তাদের আনন্দ বিধান করত তোদের পূর্ব পুরুষ, কিছু না বুঝে শুধু ভক্তিবাদের বিশ্বাসে, তা এখন তো যুগ পাল্টেছে, নতুন জন্মের মানুষ তোরা যদি যুক্তির উপর ভর দিয়ে দীর্ঘদিনের শিকড়-সমৃদ্ধ এই সব সামাজিক আগাছাকে উপড়ে ফেলতে পারিস, তা হলে তো দারুণ আনন্দের কথা।' —অমলের কাঁধে পরম আস্থায় হাত রেখে হাসি মেশানো কথাগুলো বলল রামানুজ।

একথা শুনে অমলের যুক্তিবাদী মনটা দারুণ তৃপ্ত হল। সে বলল, 'তা হলে স্যার, আপনিও যখন একথা বল্লেন, তখন সারা গাঁয়ের লোক বল্লেও আমি আর দশমুখী বাণটা নিচ্ছি না। আমি আসছি স্যার।' চোখে মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি নিয়ে অমল চলে গেল।

সেদিন রাত্রে গ্রাম্য আটচালায় গাজন উৎসব সম্পর্কে সভা বসেছে। গ্রামের কর্তা ব্যক্তিরা সবাই হাজির। রামানুজও, সে সভায় উপস্থিত ছিল। সেদিনই অমল যে ভাবে বৃদ্ধ পক্ককেশ সমৃদ্ধ গ্রামীন মাতব্বরদের তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করল তা চোখে না দেখলে অবিশ্বাস্য। দশমুখী বাণটা ধারণ করবার জন্য তাকে কেউ রাজি করাতে পারেনি, হাজারো অমঙ্গল আশঙ্কা তার হৃদয়কে দুর্বল করতে পারেনি। বরং তার যুক্তিতে ফালা ফালা হয়ে গেছে বৃদ্ধ মোড়লদের কথা। তারই একজন ছাত্রের এরকম নির্মোহ, যুক্তিবাদী

সচেতনতা লক্ষ্য করে যুগবৎ আনন্দ আর অহংকার নিয়ে রামানুজ সেদিন আটচালা থেকে উঠে আসার আগে অমলের দিকে যখন তাকালো, অনেকটা বিভ্রমেই তখন সে দেখলো, অমলের আপাদ-মস্তক আলোক-উদ্ভাস।

———